দি ঘাটাল

পিপ্‌লস্‌ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

ঘাটাল ★ মেদিনীপুর

স্থাপিত—১৯১১

ফোন নং ঃ ঘাটাল-৫৫-১৫৫

দীর্ঘ ৮৯ বৎসর ধরে ঘাটালবাসীর বহুমুখী সেবায় নিয়োজিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণাধীন সমবায় ব্যাঙ্ক (সমবায় রেজিঃ নং—৮১৭ তাং—১৩-৫-১৯১১ এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক লাইসেন্স নং—ইউ-'ধ-ডি-ডবলিউ-বি-৮২৮ পি ।

যা আপনাকে দিতে পারে ঃ

- সব রকমের আমানতকে বীমা প্রকল্প দ্বারা সুরক্ষিত রাখা।
- আমানতের উপর বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের তুলনায় ½ সুদ বেশী প্রদান করা।
- বিল কালেকশন ও ড্রাফট ইস্যু করা।
- দুর্বলতর শ্রেণীকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কর্জ্জ দাদন করা।
- সেফ ডিপোজিট লকার-এর সুযোগ প্রদান করা।
- স্বর্ণালঙ্কার জামিনে কর্জ্জ দাদন করা।
- দুই, তিন বা চার চাকা মোটর-যান কিনতে সহজ সর্তে কর্জ্জ দাদন করা।

এই ব্যাঙ্ক আপনার ব্যাঙ্ক। আপনার সহযোগিতাই আমাদের মূলধন। আপনার মূল্যবান পরিদর্শনের অপেক্ষায় রইলাম। সমবায় দীর্ঘজীবি হউক।

শ্রীরণজিত কুমার বেরা
সভাপতি

শ্রীতপন ভট্টাচার্য্য
সম্পাদক

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন ঃ

ভাণ্ডারী ডেণ্টাল হল

দাঁত তোলা এবং দাঁত বাঁধানোর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
দাঁতের যাবতীয় রোগের যত্ন সহকারে
চিকিৎসা করা হয়।

অভিজ্ঞ দন্ত চিকিৎসক –

ডাঃ এ. কে. ভাণ্ডারী

ঘাটাল পোষ্ট অফিসচক
ঘাটাল : মেদিনীপুর

ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য অভিনব আয়োজন—

দার্জিলিং, পুরী, হরিদ্বার সহ ভারতের বিভিন্ন দর্শনীয় জায়গায় ঘুরতে থাকার জন্য প্রত্যহ মাত্র ৪০ টাকা থেকে ১২৫ টাকার মধ্যে **হলি-ডে হোম** আপনার সুবিধা মত তারিখে (ছুটির পূর্বে) বুকিং করা হয়। তাছাড়া **হোটেল** বুকিং-এর ব্যবস্থাও রহিয়াছে।

দিল্লী, বোম্বাই, জয়পুর, পাঞ্জাব, আমেদাবাদ, দার্জিলিং, পুরীসহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের রিজার্ভেশন টিকিট করে দেওয়ার সুব্যবস্থা আছে।

কুইক সুপ্রিম ক্যারিয়ার সার্ভিস

ভারতবর্ষের যে কোন শহরে চিঠিপত্র পাঠানোর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

- কলিকাতার সমস্ত পিন কোড-এ চিঠিপত্র আদান প্রদান করা হয়।

❋ যোগাযোগ ❋

অল ইণ্ডিয়া কুইক রিজার্ভেশন সেণ্টার

ঘাটাল হাসপাতালচক্, মেদিনীপুর

(ডাঃ অসিত দত্তের চেম্বারের নিকট)

সকাল ৮টা থেকে রাত্রি ৯টা, পর্যন্ত অফিস খোলা থাকে।

'ঘর মানে শুধু মাথার উপর ছাদ নয়
ঘর মানে স্বপ্ন আর সৌন্দর্য
আর স্বপ্ন মানেই রঙ এবং
রঙের বৈচিত্র্য।
আসুন, আপনার ঘর-বাড়ি স্বপ্নের রঙে
সার্থক করার জন্য অপেক্ষায় আছে।

ঘাটাল রং ঘর

[কোঙ্গর সুপার মার্কেটের দ্বিতলে]

ঘাটাল-পাঁশকুড়া বাসস্ট্যাণ্ড

ঘাটাল ঃ মেদিনীপুর

এখানে আই-সি-আই, এশিয়ান পেন্টস্, এভারেক, ব্ল্যাক জাপান
ইত্যাদি বিভিন্ন অভিজাত কোম্পানীর রঙ খুচরা ও
পাইকারী পাওয়া যায়।

• ডিসটেম্পার, স্নোসেম, টাটাসেম এবং চুন পাওয়া যায়।

স্বা স্থ্য

আনন্দ সংবাদ !! আনন্দ সংবাদ !! আনন্দ সংবাদ !!

* এখন থেকে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 300 M. A. মেশিনে নিখুঁত এক্স-রে করা হচ্ছে।
* শরীরের সূক্ষ্ম অংশের নিখুঁত ছবির জন্য এই মেশিন বিশেষ কার্যকরী।
* ঘাটাল শহরে একমাত্র এখানেই এই মেশিন আছে।

স্বস্তি এক্স-রে ক্লিনিক

ফোন ঃ ৫৫-১৯১

এখানে দিবারাত্র এক্স-রে করা হয় এবং কলকাতার অভিজ্ঞ রেডিওলজিস্ট দ্বারা রিপোর্ট করা হয়।

কুশপাতা (পেট্রল পাম্পের বিপরীতে)

ঘাটাল ঃ মেদিনীপুর

ঘাটাল পৌরসভা

- নিয়মিত কর মেটান। পৌর উন্নয়নে সহযোগী হন।
- পৌর উন্নয়ন কাজে—কেন্দ্রীয় বাসস্ট্যাণ্ড তৈরী, আই, ডি এস, এমটি, বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ বিষয়ে যতীশচন্দ্র ঘোষ স্মৃতি সদন নির্মাণে পৌর কর্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতা করুন।
- ড্রেনেজ স্কীম, বস্তি উন্নয়ন, ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প চালু ও এলাকার উন্নয়নে পৌর কর্তৃপক্ষের সহিত সোচ্চার হোন।
- ঘাটাল মাষ্টার প্ল্যান অবিলম্বে চালু করার জন্য সংঘবদ্ধভাবে পৌর কর্তৃপক্ষের সহিত দাবী রাখুন।
- সাক্ষরতা ও রোগ প্রতিষেধ কর্মসূচীতে এলাকার জনগণের সহযোগিতা কাম্য।
- পরিবেশ দূষণ বন্ধে এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- পৌর সম্পত্তি বে-আইনী দখল বন্ধ করুন ও পৌরসভায় খবর দিন।
- সার্বিক উন্নয়ন প্রশ্নে—পৌর কর্তৃপক্ষ আপনার সাহায্য প্রার্থী।

শ্রীসাধুচরণ পাল
পৌর-উপপ্রধান

শ্রীঅজিতকুমার সাঁতরা
পৌরপ্রধান

লক্ষ্মণ কর্মকার কর্তৃক সম্পাদিত এবং বিষ্ণুপদ মান্না কর্তৃক প্রকাশিত
মুদ্রণে জনতা প্রেস / ঘাটাল / মেদিনীপুর ৭১২২১২

সৃজন

শারদীয়, ১৪০২

With Best Compliments from :

[redacted]

KIS[redacted]NJ

TRA[redacted]NG CO.

[redacted]

Kishanganj

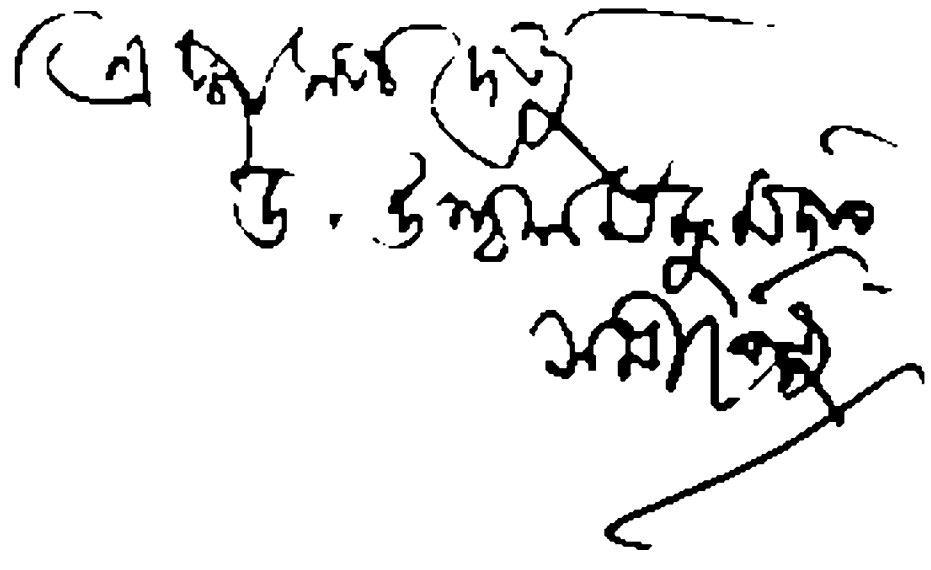

সৃজন

শারদ সংকলন

১৪০২

সম্পাদনা : লক্ষ্মণ কর্মকার

সম্পাদকীয়

এসো ফুল ফোটাই

[redacted]এসো ফুল ফোটাই
সময়ের হাতে দেব কুসুমের অঞ্জলি

অপেক্ষায় লুকিয়ে থাকে দস্যুমেঘ। আমাদের
সংকল্পের কথা শুনে একটানা বৃষ্টি ঝরায়
বীজ ক্ষেতে; মতগুলি সরকারী জলাধার
উগড়ে দ্যায় হলাহল—
কাঁসাই আর শীলাবতী ফুঁসে ফুঁসে তোলপাড় করে
আমাদের তোমাদের প্রিয় বন্ধুদের ঘর গেরস্থালি।

ফসলে ভরিয়ে দেব মাঠ; শ্রমক্লান্ত মুখে
এনে দেব শুচিস্মিত হাসি—
কান পেতে শুনেছে শয়তান; আমাদের এই
সম্মিলিত গান। ফন্দি আঁটে, ফিস্‌ফিস্
পরামর্শ নয়; আগ্রাসী লোভে থাবা তোলে
প্রতিদিনের জীবনযাপনে—

[redacted]থরের বুকে লেখা হবে
আমাদের শ্রম ও মেধার অমলিন গাথা
রাজসভা টলে যাক; শাসনে-শোষণে
রক্তাক্ত হোক দিন প্রতিদিন—

আমরা ভালবাসব মানুষকে:
আমাদের সঙ্গী হবে ভালবাসার গান।

‘সৃজন’ সুস্থ সংস্কৃতির মুখপত্র হোক

‘সৃজন’ তারুণ্যের মুখপত্র হোক

অধ্যাপিকা শর্মিষ্ঠা রায়
রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়
নাটাল [] মেদিনীপুর

আপনার স্বপ্নের বাড়িটি
তৈরীর জন্য যখন কাজে নামবেন
তখন কায়েকজন কাজের বন্ধু চাই—চাই-ই·····
আপনার তেমন বন্ধু রূপে
অপেক্ষায় আছে—

প্রদীপ এণ্টারপ্রাইজ

[বিল্ডিং মেটিরিয়াল সাপ্লায়ার্স]

প্রোঃ—প্রদীপ মোদক

কোন্নগর (জুবট্যাঙ্কের কাছে) ঘাটাল ☐ মেদিনীপুর

☐ ধোঁয়াহীন গুল এবং কুঁড়া খুচরা ও পাইকারী পাওয়া যায়।

শারদীয় শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন ঃ

মা সন্তোষী অটোমোবাইল

এখানে ডিজেল পেট্রল, মবিল এবং সাদা
কেরোসিন বিক্রী হয়।

প্রোঃ—মানিকলাল মাইতি

কুশপাতা (হাসপাতাল ২নং গেটের সামনে)
ঘাটাল ঃ মেদিনীপুর

'সৃজন' এর অগ্রগতিতে

আন্তরিক অভিনন্দন :

শতদ্রু হড়

সৈকত হড়

প্রযত্নে **অধ্যাপক প্রণবকুমার হড়**

কোন্নগর ঃ ঘাটাল ঃ মেদিনীপুর

'পাণের জিনিস কত দিন
স্ত্রী জীবনে চিরদিন'

ঃ সৌজন্যে ঃ

দেবযানী ধূপ

হিন্দুস্থান পারফিউমারী ওয়ার্কস

গম্ভীরনগর ঃ ঘাটাল ঃ মেদিনীপুর

শহরে গঞ্জে বড় বড় বাড়ি ভেঙে পড়ার
সংবাদে বিচলিত হবেন না।
মজবুত, নিশ্চিন্ত বাড়ি গড়ে তোলার জন্য
চাই বিশ্বাসী
নির্ভরযোগ্য ইট।
আজই যোগাযোগ করুন ঃ

'অশোক' মার্কা ইট
'অশোক' মার্কা ইট
'অশোক' মার্কা ইট

প্রোঃ—অশোক পোড়ে

নতুনব্রীজ ঃ ঘাটাল ঃ মেদিনীপুর

পাঁচবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

দাসপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতি

মেদিনীপুর

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা মানুষের
সার্বিক অগ্রগতির একমাত্র হাতিয়ার।
এই বিশ্বাসে আস্থা রেখেই পাঁচবেড়িয়া
গ্রাম পঞ্চায়েত কাজ করে চলেছে।
সার্বিক সাক্ষরতার জন্য, কৃষকের উন্নতির জন্য,
পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে, মানব সম্পদ
বিকশিত করতে এবং গণচেতনার উন্নয়নের
জন্য আমাদের পঞ্চায়েত কাজ করে চলেছে……।

কল্যাণী বারিক
উপ-প্রধান
পাঁচবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

নির্মল মাইতি
প্রধান
পাঁচবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

রেজিঃ নং -১৮

তাং—৩০-১১-৯১

তমলুক-ঘাটাল-হলদিয়া
মহিলা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংস্থা)

উল্লেখযোগ্য পরিষেবা

★ সমস্ত প্রকার আমানতের উপর বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের তুলনায় ০·৭৫ শতাংশ সুদ বেশী।

★ আমানত বীমা প্রকল্পের মাধ্যমে আপনার আমানত এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য :

★ বিভিন্ন জমা প্রকল্প • ফিক্সড্ জমা প্রকল্প রেকারিং জমা প্রকল্প • কেবলমাত্র মহিলাদের ঋণ দানের সুযোগ • ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ঋণ এবং চাকুরীজীবির জন্য ঋণ।

: হেড অফিস :

ডহরপুর (শঙ্করআড়া পুল) তমলুক, মেদিনীপুর
পিন-৭২১৬৩৬

: ব্রাঞ্চ :

চন্দ্রকোণা টাউন ★ ঘাটাল ★ ডহরপুর

'সৃজন' এর সমৃদ্ধি কামনা করি ঃ

পঞ্চায়েত গ্রামীণ মানুষের উন্নয়নের হাতিয়ার।
নিয়মিত কর প্রদান করে এবং পঞ্চায়েতের
সমস্ত জনকল্যাণমূলক কাজে সক্রিয়
অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করে এই উন্নয়ন
অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখুন।

অমল তেওয়ারী
উপ-প্রধান
মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

রেণুপদ ভট্টাচার্য
প্রধান
মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

Best Wishes 'Sreejan'

Eastern Multi Welfare Society

Medical Relief, X-Ray & Traning Centre

Registration No.—S/72349

Medical Relief

(Chamber)

Every Sunday—8-30 to 11-30

Wednesday—2-30 to 4-30

12/1G, Bechulal Road

Calcutta-700014

শারদ উৎসবে

প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন :

অনেক ফ্যাশান রঙের বাহার
রেডিমেড আর শাড়ির পাহাড়
স্যুটিং-শার্টিং উচিত দাম
'নিউ রাজা-রাণী' একটি নাম।

নিউ রাজারাণী বস্ত্রালয়

[অভিজাত বস্ত্র প্রতিষ্ঠান]

ঘাটাল কুঠিবাজার ঃ ঘাটাল ঃ মেদিনীপুর

ঘাটাল পঞ্চায়েত সমিতি

ঘাটাল ▫ মেদিনীপুর

- ঘাটাল ব্লককে নিরক্ষরতা মুক্ত করার জন্য সর্বস্তরের মানুষের সক্রিয় সহায়তা প্রয়োজন।
- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখুন।
- পরিবেশ দূষণ রোধের জন্য গাছ লাগান।
- গ্রামীণ উন্নয়নের স্বার্থে ও গণমুখী প্রশাসন গড়তে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে তুলুন।
- প্রতিটি পরিবারকে নিবিড় স্বাস্থ্যবিধান আওতায় আনুন।

সাধন সামন্ত
সভাপতি
পঞ্চায়েত সমিতি, ঘাটাল

জীতেন্দ্র রায়
কার্যনির্বাহী আধিকারিক
পঞ্চায়েত সমিতি, ঘাটাল

সূচিপত্র

কবিতা ১—১৬

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় নীরেন্দু হাজরা অনিমেষ বসু
প্রমোদ নাথ প্রণব চট্টোপাধ্যায় রামেশ্বর পাণিগ্রাহী
রূপাই সামন্ত সূর্য নন্দী কাশীনাথ সাহা
অ'ময়কুমার সেনগুপ্ত নিমাই মাল্লা স্বপন নন্দী
গৌতম বিশ্বাস বিশ্বজিৎ ঘোষ অভয় নাগ
আশিস সরকার শান্তি রায় সুবীর ঘোষ
বিবেকানন্দ দাস

গল্প

অনিল পড়াই পেট ভাতা / ১
তুষার চট্টোপাধ্যায় বাজাচ্ছের লক্ষ ১৩
চিন্ময় দাশ ছাল চামড়া / ৩৩
পাপিয়া ভট্টাচার্য এখানে পিঞ্জর / ৪১

সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ

দীপ্তি সরকার : অপসংস্কৃতি প্রতিরোধে নারীর ভূমিকা / ৪৬
বসন্তকুমার রায় মানব সংস্কৃতি ও জীবতন্ত্র / ৭৩
বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য ঘাটালের শীতলা পূজা ও সঙ্ বিচিত্রা / ১১৩

একগুচ্ছ কবিতা ৬১—৮০

নিলয় মিত্র তপনজ্যোতি মাজী বিরূপাক্ষ পাণ্ডা দুরন্ত বিজলী
কৃষ্ণা দাস বিশ্বজিৎ অধিকারী বঙ্কিম মাজী অসীম শাসমল
পুলক রায় অশোক অধিকারী ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
এস. ইউসুফ আহম্মদ হিমাংশু নন্দী দেবাশিস্ ভট্টাচার্য
শক্তি সিংহ অনুত্তম বিশ্বাস অঞ্জনাভ ষষ্ঠী দত্ত গুরুপদ মজুমদার
সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় হাফিজুর রহমান প্রশান্ত মানিক
পার্থ ভট্টাচার্য দেবু বন্দ্যোপাধ্যায় জয়দেব ঘড়া
বরুণকুমার চক্রবর্তী স্বপনকুমার মাজী

আরো গল্প

অজয়কুমার বাগ অস্তিত্বের এইসব সেইসব / ৮১
তারাশঙ্কর পানিগ্রাহী মনীশ বেঁচে নেই / ৮৭
বিনোদ মণ্ডল সুভাষিণীর পদত্যাগ / ৯৩
দেবল বন্দ্যোপাধ্যায় শহীদের রক্ত / ১৩৭

চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ

অরুণাভ বেরা শতবর্ষের আলোকে সাম্প্রতিক বাংলা
চলচ্চিত্র / ১০১

আবার কবিতা ১১৯—১২৭

শ্যামাপদ প্রামাণিক রাম মাইতি ডাঃ সুদর্শন রায় জয়দেব মূলা
অরিন্দম পৃথিবী রামমোহন সামন্ত ক্ষুদিরাম মণ্ডল
সুদর্শন চক্রবর্তী নিমাই করণ এবং
দিলীপ কুমার বাগ

সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ

অরুণ কুমার পাল — রাজনীতি ও সমরেশ বসুর গল্প / ১২৯

হরগোবিন্দ দোলই — বিষ্ণু দে'র কবিতায় রবীন্দ্র-উত্তরাধিকার / ১৪১

অশোক পাল — আশাপূর্ণার উপন্যাসে নারী ব্যক্তিত্ব / ১৪৭

পত্রিকা পর্যালোচনা
এবং
গ্রন্থ সমালোচনা

সংস্কৃতি সংবাদ

সৃজন

সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

উপদেষ্টামণ্ডলী :

ড. আশিস্‌কুমার দে অধ্যাপক অমিতাভ সরকার

অধ্যাপক অজিতকুমার চক্রবর্তী অনির্বাণ রায়চৌধুরী

: সম্পাদক :

লক্ষ্মণ কর্মকার

: সহ-সম্পাদক :

অশোক পাল

: সম্পাদকমণ্ডলী :

অমিত রায় তপনজ্যোতি মাজী মাণিকচন্দ্র দাস

এবং হরগোবিন্দ দোলই

: সহায়তায় :

অশোক ভট্টাচার্য্য অরুণ পাল হরেন্দ্রনাথ বেরা বরুণ চক্রবর্তী

রাম মাইতি এবং জয়দেব মুলা

: প্রচ্ছদ মুদ্রণ :

চিত্রণ • ঘাটাল • মেদিনীপুর

পত্রিকা মুদ্রণ : জনতা প্রেস / ঘাটাল / মেদিনীপুর

বলিষ্ঠ জীবনবোধের কবিতা পড়ুন
ভঙ্গি নয়, ভাবনার শিল্পিত
অনুভূতি—

কবি স্বপন মাজীর

এক মুঠো আগুন

[কবিতা সংকলন]

মূল্য ৭ টাকা

[] প্রাপ্তিস্থান []

অন্নপূর্ণা প্রেস

খুকুড়দহ [] মেদিনীপুর

চাঁদের হাটে

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

ফুল ছিঁড়ে সে আগুন জ্বালে
একটি নতুন জীবন আঁকে—
পুরানো সব গল্পগুলো
দেয় ছড়িয়ে নদীর বাঁকে !

এমনি করে সারা জীবন
কেবল হাসি কেবল খেলা
শুকনো বালির চরে বসায়
আয়েস করে রঙের মেলা।

জন্ম থেকেই শুরু যে তার
নিজের সাথে যুদ্ধ তুমুল
দেয় ফুটিয়ে ভাতের থালায়
চোখ জুড়ানো হীরের মুকুল।

শস্য তাকে ডাক দিয়েছে
গানের সুরে সবুজ মাঠে—
জীবনকে সে দেখছে এখন
স্বপ্ন মাখা চাঁদের হাটে।

মহুয়া ফুলের গন্ধ

.....

নীরেন্দু হাজরা

মহুয়া ফুলের গন্ধ
ভাসে,
যেন আদিবাসী এক নদীর বুক থেকে,
পাশ ফিরলেই
গভীর গহন রাত
ঘুরে ফিরে, ফিরে আসে
আমার জানালা খুলে, জানালার রড্‌গুলি যেন
মাতাল আঘাতে—
আমাকে জাগায়, নীল কুয়াশায়
শূন্য মন্দিরের মতো দেবতাবিহীন
নীরবতা—
ভেঙে, ভেঙে ভেঙে
মহুয়া ফুলের গন্ধ
আমার আজ্ঞা
শূন্য পাষাণের গায়ে প্রাণের আঘাত।
উদ্ভিন্না কন্যার মুখ
উচ্ছ্বাস, আবেগে ফুঁসে ওঠে ;
আদি আকুলতা
পরস্পর
পিতা ও কন্যার মায়া টান
গোপন ভুবনে।
কেউ যদি ছোঁড়ে ঢিল পবিত্র মন্দিরে,
স্ফটিক পাথরে বাজে
আদি মীড় —
মহুয়া ফুলের গন্ধ ঘুরে ফিরে আসে
পিতার চোখের জলে।

স্বপ্নস্বপ্ন

অনিমেষ বসু

কিছু কিছু কথা থাকে
শব্দহীন, বুঝে নিতে হয়
কিছু মুক্ত সুর থাকে
অশ্রুজ্জল, তবুও বিস্ময় :
কিছু স্নিগ্ধ স্বপ্ন থাকে
চিরকাল কোন স্বপ্নদ্বীপে—
অকথিত প্রিয় কথা
হাঁটু মোড়ে শব্দের সমীপে।

কিছু ঋদ্ধ ভালোবাসা
নিস্প্রদীপ রাত্রির সোপানে—
সুরভিত স্বপ্ন এঁকে
জীবনের খুঁজে দেয় মানে ;
কিছু ম্লান চোখে থাকে
সীমায়িত সন্ধ্যার শুষ্কতা
বেদনার্ত স্তব্ধতায়
শিল্পময় নম্র কথকতা।

গভীর দু'চোখ মেলে
স্পর্শতায় বুঝে নিতে হয়—
প্রগাঢ় যন্ত্রণা বোধে,
ম্রিয়মান বিবর্ণ সময়।

রৌদ্রের কাছে যাবো

প্রমোদ নাথ

আমি পায়ে পায়ে হেঁটে যাবো
লতা গুল্ম ছড়ানো পথে,
আলোর বৃত্ত ছুঁয়ে যাবো—
পায়ে পায়ে যাবো রৌদ্রের কাছে।

আমি মেঠো পথে হেঁটে যাবো
পায়ে পায়ে যাবো অরণ্যের কাছে।

আমি অনায়াসে হেঁটে যাবো
পাশাপাশি মানুষের মিছিলে
আলোর বৃত্ত ছুঁয়ে যাবো—
পায়ে পায়ে যাবো রৌদ্রের কাছে।

ব্রহ্মাণ্ড কেঁপে ওঠে

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

সেই নিতান্ত শৈশবে
সকালে বিকেলে
যাঁরা আঙুলের ডগামাত্র ছুঁয়ে
হাঁটা শেখাতেন
তাঁরা কেউ আর নেই!
হঠাৎ হঠাৎ আঙুল ছেড়ে দিলে
পায়ের তলায় ব্রহ্মাণ্ড কেঁপে উঠতো
সে আমার টাল মাটাল অবস্থা!

এত বছর পরেও
ব্রহ্মাণ্ড কেঁপে কেঁপে ওঠে
দূর গ্রামের কোনো ষ্টেশনে
নীরবে থেমে যাই
অবসর নেওয়া গাছের পাশ দিয়ে
দীর্ঘ 'চলাচলে' মিশে যাই
ব্রহ্মাণ্ড কেঁপে কেঁপে ওঠে।

অন্য যীশু (ওড়িআ কবিতা)

শ্রীহরি দল

ভাষান্তর : রামেশ্বর পাণিগ্রাহী

উলঙ্গ আকাশের নীচে
ধূলিস্নেহ-গালিচায়
যে শুয়ে খুঁজছে সুখে
আকাশের চাঁদ.
যে গেয়ে যাচ্ছে কুলুকুলু ঝরণার গান……
তৈরী করতে একটি সুখ কাব্য
খালি-পেটে যে আঁকছে
স্বপ্নের তুলি ধরে
সুখের চিত্রাঙ্কনটি
সে তো ত্রিশঙ্কু হ'য়ে আটকে আছে
মাটি আর আকাশের মাঝে।
যেখানে কেবল
ভাবনার বিশ্বটাই ঝুলে থাকে
কানফুলের মতন।
না থাকে রক্ত চক্ষু
না থাকে সাহু-মহাজন,
না থাকে মাটির মোহ
না থাকে সিংহাসনের লোভ……
গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেয়
নিজের ভাগ্যকে।
কারো অনুকম্পায়
খুলে যায় না স্বর্গ।
খুলে যায় না কপাল-সিন্দুক।
শূন্য আরোহনে
সে পায় বাঁচবার নূতন রাস্তা

সে তো বিশ্বাসের শূন্যের উপর
ক্রুশবিদ্ধ যীশু,
সমস্ত দুঃখকে ঢক্ ঢক্
পান ক'রে ক'রে
যে লিখে যায়
জীবন-কাব্য।

প্রিয়তমাসু

রূপাই সামন্ত

দেখ
গোলাপ আছে কস্তুরী গন্ধ আছে
মেঘবালুন ছায়াও আছে
নরম হরিণী ঘাসপাতা
দেখ
আড়ুড় গায়ে আকাশ ধরেছে চাঁদের স্তন
দেখ সকাল থেকেই সমুদ্রের সরব চুম্বনে তীরভূমি
দেখ বাজারের বাসি আনাজের ঝুড়ির পাশেই
বসুমিতার নতুন বঙ্কিম চরণচিহ্ন
দেখ দেখ
এই উজ্জ্বল অনুগত শরীর নিয়ে তোমার কাছে
এসেছি পবিত্র পুণ্যবান
তবু ভিতরে ভিতরে ছিন্ন স্নায়ু রক্তে ঘা
মুখের আধপোড়া দাগের নিচেই বাহাত্তুরে বার্ধক্য

বসুমিতা আমাকে নিয়ে আর তোমার কি কাজ
ঐ দেখ আস্তাকুঁড় ঐ দেখ আস্তাকুঁড়
ফেলে দাও

যান্ত্রিকতা

.....

সূর্য নন্দী

রাতের শরীর ক্ষত হয়ে ক্ষয়রোগে নিস্তেজ
দিনমানও তদ্রুপ। ঘুমোয় না রাত, জাগে না
দিন, উচ্ছৃঙ্খল আসরে মাতলামি করে, যন্ত্রবমি
উগ্‌রে দেয় সনাতন পৃথিবীতে

অসহায় গাছও এসব ন্যাখে, নিজে বাঁচে, সারাতে পারে না
মানুষের ক্ষয়রোগ ;
রাতদিন যদি স্বেচ্ছাচারী হয় যন্ত্রাচারী হয়,
হৃদয়ে হৃদয় যদি না থাকে
কে বাঁচাতে পারে তাদের ?

সময়ের মাথায় মুকুট আর মুকুটের ভেতর
যন্ত্র টিক্ টিক্ করে। দিনরাত টিক্ টিক্ করে যায়
দিনরাত ক্ষয় হয়, ক্ষয়।

বৃষ্টি বৈভব

কাশীনাথ সাহা

বৃষ্টি দাও মেঘবালা বৃষ্টির বৈভব
যেমন নদীর সাথে স্রোতের সখ্যতা
তেমনি গভীরে এসো সুষুপ্তি বিশ্বাসে
পথের প্রারম্ভে দাও—সুদূরের ডাক
যে মন্ত্রে সঙ্গীত সুর কবিতাকে ডাকি
সেই ডাকে ডাকো তুমি নির্ভর স্তবেতে
একাকিত্ব ভেঙে দাও বৃষ্টি বৈভবে ॥

আহাঃ, চাঁদ

অমিয়কুমার সেনগুপ্ত

আহাঃ চাঁদ, ডুবে গেলি রাত না পেরোতে, কই ভোর
এখনো হয়নি, কই পাখি তো ডাকেনি, তবু তোর
কেন এই ডুবে-যাওয়া, কেন এই সহসা প্রস্থান ?
আকাশে তো মেঘ নেই, মাটি ও মনের ব্যবধান
তুই ও শেষে বুঝলি না, খুঁজলি না জীবনের ফুল
অথৈ জ্যোৎস্নায় যার বুক ছুঁয়ে ওড়ে ভীমরুল
সমুদ্র পায়ের তলে, হাতের মুঠোয় যার ধুলো
মন্ত্রের মতন সোনা হবে ভেবে রাতে তারাগুলো
জেগেছিল, সহসাই তাদের শরীরে এলো ঘুম—
বাদুড়ের ডানা বেয়ে ঝরে গেলো আলোর কুসুম—
মাটিতে নামতে পারে, মাটি তা'র লাগে পায়ে-পায়ে
উষার প্রসব ব্যথা কে ছড়ালো তোর সারা গায়ে।

তোর তো কথাই ছিলো সূর্য যদি ঘুম থেকে উঠে
সিঁদুর ছড়িয়ে দেয় মেরুরেখা ভেঙ্গে অক্ষপুটে
তার দিকে পিছু ফিরে চলে যাবি নিজ ভঙ্গিমায়
কই সূর্য ? কই সেই দীর্ণ দিগন্তের মুখ, ঠায়
এখনো গাছের ডালে ঝুলে আছে রাত, স্তব্ধ হাওয়া—
তথাপি কেন যে তোর অকস্মাৎ এভাবেই যাওয়া
নদীতে এখনো কেউ বাঁধেনি নৌকোর খেয়াকড়ি।

অথচ অতন্দ্র ছাখ্, সব বৃক্ষে প্রাণের প্রহরী
এখনো শোনেনি গান, আসেনি কি আগুয়ান কবি ?

সারা বুকে যে বাজায় অন্ধকারে অকাল ভৈরবী—

আহাঃ চাঁদ, চলে গেলি ফেলে রেখে অনির্বাণ মুখ—
এখন কি করে খুঁজি অকালে-হারিয়ে-যাওয়া সোনার ঝিনুক।

বৃষ্টি এলে

নিমাই মাল্লা

বৃষ্টি এলে
ভালো হোতো :
জাগতো মাটি,
হাসতো ধরা।

বৃষ্টি এলে
ভালো হোতো :
বলতো কথা
যতেক মরা।

বৃষ্টি এলে
ভালো হোতো :
পাখীর কণ্ঠে গান।

বৃষ্টি এলে
ভালো হোতো
নদীর বুকে বান।

বৃষ্টি এলে
জাগতো জীবন
আকাশ-বাতাস জুড়ে
বীজের দানা মেলতো পাখা
শক্ত পাথর ফুঁড়ে।

বৃষ্টি এলে
ভালো হোতো
পাখীর কণ্ঠে গান।
বৃষ্টি এলে
ভালোই হোতো
নদীর বুকে বান।

আরও ফুল আরও বৃষ্টি

স্বপন নন্দী

বলেছিলাম, আজ আনবো দেখো তেমনি এক শাড়ি
যেমন মানায় গৌরীকে তার শারদ সকালে

অনন্ত মেঘের কাছে তন্নিষ্ঠ নিবেদন রাখি নি, তবুও সারাক্ষণ বৃষ্টি
ইচ্ছে হলো ভিজে যাই, ভিজে যাও তুমি, ভিজে গেলামও আমরা
দুজনেই।

যা তারা নিলো আজ কপট কৌশলে, আমাদের রুটি থেকে
যতটুকু তাপ
যা তারা নিলো আজ, হৈমন্তী ভাত থেকে
যতটুকু ভাপ
এই জ্যোৎস্নার আকাশে দুজনেই ছড়িয়ে দিচ্ছি কথাময় মঞ্জুষা থেকে
অকথন বেদনা
এই নীলাঞ্জন সন্ধ্যাকে আমরা পরিয়ে দেবো তেমনই প্রস্থনা:
আছি, আছি বড়ো সৌম্যতায়, আছি
যতই কেড়ে নিক তারা আমাদের শ্রম ও মেধার নির্যাস
ভালবাসা, রাগ ও রঞ্জন

আরও আরও ফুল বাগানে উপচে পড়বে
অনন্ত মেঘের কাছে অকারণ বৃষ্টির প্রার্থী
দুজনে, দুজনেই।

কবিতার 'তুমি'

গৌতম বিশ্বাস

'তুমি' মানে তুমি নও—
তোমার ভুবন,
তোমার অমিয় জ্বালা প্রেম ক্ষেম মর্যাদা ঋণ
অথবা সঙ্কোপন
পৃথিবীর সাথে কোনো গূঢ় পরিচয়।

'তুমি' মানে—
গভীর পত্রাবলী
ভাঙা স্বপ্ন, ভাঙা ইতিহাস,
পারুলডাঙার বুকে সৃষ্টির শেষ হাততালি
ফুটপাথে ছিন্নমূল রিক্ত পরবাস।

'তুমি' মানে তুমি নও—
হৃদয়ের কলমের রক্তরেখা,
দূরের বৃষ্টিধারা দৃষ্টি উজান,
বিদ্রূপে অবিচল সত্য বিভীষিকা,
মানুষের দৈব তুমি, ভূমিজার প্রাণ!

নিজের ভেতর

বিশ্বজিৎ ঘোষ

নদী ছুঁয়ে থাকা
এই যে জ্যোৎস্না
কতটুকু ঘনিষ্ঠতা এনে দিতে পারে?

গোধূলির ঝ'রে গেলে
চিরনদী জল বিষাদ জাগায়

অকারণে কোন কথা কেউতো বলেনা
হৃদয়ের স্বচ্ছ সান্নিধ্যে—!

ব-দ্বীপের মত গড়ে ওঠে
চিরলীনা প্রেম—
সে কথা কেউ তো বোঝে না
না নদী না জ্যোৎস্না

আকণ্ঠ জীবন নিয়ে তবু
ক্যানভাসে জাগিয়ে তুলেছি
কবিতার অথৈ শরীর।

সেতু বন্ধন

অভয় নাগ

যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই।
শান্তির স্বপক্ষে গাও গান
দেখবে তুমিও
পৃথিবীর সব বন্ধ দরজাগুলি
একে একে খুলে গেছে তোমার জন্যে!
পৃথিবীর সব মানুষ
কী অনাবিল শান্তির স্নিগ্ধতায়
শ্বেত পারাবত ওড়ায় বারবার!

তুমি সেই শান্তি-যজ্ঞের শ্বেত পারাবত ওড়ানো দেখলে
এক বুক প্রশান্তি নিয়ে মানুষের মনের সঙ্গে মনের
মিতালীর সেতুবন্ধন ঘটাতে পারবে,
সেইদিনই সার্থক হবে তোমার জন্ম!

মানুষ কি কমে যাচ্ছে দ্রুত

.....

আশিস্ সরকার

মানুষ কি কমে যাচ্ছে দ্রুত
আর মানুষের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে
অনেক ছদ্ম মানুষ

হিংস্র দাঁত নখ ঢেকে ফেলতে তৈরী হচ্ছে
বিরাট অঙ্কের বহুমূল্য পোশাক
রাঙাদের মত পোষাক-আসাক্

মিথ্যে নয়
তবু একপেশে অতি বুদ্ধিজীবী প্রচারের তোড়ে
আমি কি বনে যাচ্ছি না তাড়া-খাওয়া বন্য এক প্রাণী
কিংবা আস্থাহীন নির্বাক-মানুষ

ক্রমেই ভুলে যাচ্ছি
মানুষের রক্তে গড়ে উঠছে
ভালবাসার নতুন নতুন আবাদের চর

কবি ও সময়

.....

শান্তি রায়

সময়ের জন্য নিয়ে এসেছি চিত্রার্পিত সুখ মায়াবী হরিণ
জন্ম দুঃখিনী হাওয়ার পরশ নেই—না আদর না অভিমান
আমি অভিমানের পাশে বসলেই অরূপ ক্রেস্কোর মতো
চন্দ্রকায় নদী. জীবনের অমিত রূপ-লাবণ্য
…কে তখন আমার নাম ধরে ডাকে ?
সে কি আমার জাতিস্মর স্মৃতি কবিতার পাণ্ডুলিপি… !

হোঃ হোঃ হাসতে থাকে সমকালীন প্রতারক,
চোয়াল-শক্ত-করা বাঘের মুখোশ

সময়ের জন্য সুখের জাভিম প্রিয় মায়াবী হরিণ নিয়ে এলে
তামাম পৃথিবী এলোচুলে চোখ মেলে তাকায়—
বলে : 'আমাদের সমকালীন প্রিয় কবি,
তোমার জন্যই এখন আমাদের চমকানো উজ্জ্বল সোহাগ
তোমার জন্যই এখন আমাদের দরদী কুর্নিশ···!!'

সন্দিগ্ধ শূণ্যতা

.....

সুবীর ঘোষ

আমাকে দিয়েছে এনে বিকেল বেলার রোদ পুরু অপবাদ
হাঁসের গ্রীবার মতো শীতল সম্মতি মাখা চোখ
এসেছো অনেক কাছে, তবু দূর থেকে
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয় বারবার
যূথবদ্ধ মানুষের দৌড়ে দলা দলা কলঙ্ক ছুঁড়ে যায়।
আমাকে দিয়েছে শাস্তি পুরস্কার বিবিধ প্রকার
এরকম ব'সে থাকা কখনো কি দেখেছো আমার ?
বালক বয়সে দেখা সেই গলিপথ
আজো খুঁজে ফিরি
দ্রুত চুম্বনের মৃদু আলোয় যবনিকাপাত
অসমাপ্ত আকাশ থেকে গিরিখাদ
সন্দিগ্ধ শূণ্যতা আনে
নিজস্ব শব্দগুলো শ্মশানের শৈত্য প্রবাহে
ছাই এর মতন উড়ে যায়।

বিবেকানন্দ দাসের দু'টি কবিতা

গঞ্জের মানুষ

তেত্রিশ ক্রোশ হেঁটে উঠে এলো গঞ্জের মানুষ
রাখলো পা এই প্রথম শহরে
ঠা-ঠা রোদ্দুরে।
এই শহরে বৃষ্টি পড়ে বছরে তিনবার
ফুল নেই ফল নেই গাছে শুধু
হলুদ পাতার বাহার।
চাঁদ ওঠে না, সূর্য সব সময় মধ্যগগনে
আকাশ ধূসর, বাতাসে কুট তামাকের গন্ধ
ফুটপাত জুড়ে হেঁটে যায় জিরাফ-মানুষ
ভাস্তব শব্দ তুলে গাড়িগুলি ছুটে চলে
প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসারের গতিতে.
বাড়ির জানালাগুলি থাকে বন্ধ, দরোজা
কদাচিৎ খোলে।

শহরের হৃৎপিণ্ডে পা রেখে দাঁড়ায়
গঞ্জের মানুষ।
অবাক চোখে জরিপ করে চারপাশ।
ঘুরে ঘুরে একে একে দেখে নেয়
চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, ঘোড়-দৌড়ের মাঠ,
শহীদস্তম্ভ, কসাইখানা, শহরের শ্মশানভূমি।
সূর্যাস্তের আগেই
শহর ছেড়ে
তিপান্ন ক্রোশ হেঁটে নেমে আসে
গঞ্জের মানুষ
গঞ্জে। খাটো মানুষ।

শহরের মানুষ

তেত্রিশ ক্রোশ হেঁটে এসেছে শহরের মানুষ। গঞ্জে। লম্বা মানুষ।
তার জন্য উনোনে জলপিঁড়ি দাও,
হাত-পাখা নিয়ে এসো, বড্ড গরম যে—
তামাক সাজো, সরবত কর গন্ধ লেবুর,
জল খাবারে দিও দই-মুড়ি-কলা, পুকুরে
জাল ফেলে বেটো রুইটা ধর, ব্যঞ্জনে
ঝাল কম দিও। দেখ, তার যেন কোন
অসুবিধে না হয়, আর বিছানায়
ছড়িয়ে দিও এক আঁচলা বেলফুল।
ও মেয়েরা, ও ছোঁড়ারা, তোরা হাঁ করে দেখছিসটা কি!
যাঃ, সরে যা। বাতাস লাগতে দে। আরে বাবা, মানুষটা
তো এক্ষুনি চলে যাচ্ছে না!

বুড়ি, তুই ওনাকে ঘুঘুডাঙ্গার জঙ্গল, গোলদিঘি, তিরাইপুরের
জাগ্রত কালীবাড়ী, পুরনো বাজার ঘুরিয়ে
আনিস। কালকে চড়ক মেলায় নিয়ে যাস।
গাজন সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিস।
ভারি মজা পাবে। সময় বুঝে একটা দিন
বায়োস্কোপও দেখিয়ে দিস।

ও নন্দর মা, শোনো। তিনের জায়গায় আজ যে
তের দিন হল। বাবুর যে নড়বার নাম নেই।
তবে ক'দিনেই চেহারাটা বেশ খোলতাই হয়েছে।
কি বল! তোমরাও দিব্যি আছো। শহরের
গল্প শুনছো। ভালমন্দ খাওয়া দাওয়া হচ্ছে।
ঘরে যেন একটা মোচ্ছব লেগে গেছে।
মন্দ কী! আনন্দে কাটলেই হল।

ও গুগা, বাবু কাল সকালেই চলে যাবেন। বুড়ো-
শিবতলা পর্যন্ত এগিয়ে দিস। সঙ্গে একটা ছাতা নিয়ে যাস।
চক্তিরের রোদ্দুর! দেখিস, বাবুর যেন কোন কষ্ট না হয়।
হুগগা হুগগা।
তের ক্রোশ হেঁটে ফিরে গেল শহরের মানুষ।
শহরে। লম্বা মানুষ।

পেট ভাতা

অনিল ঘড়াই

পেট ভাতার কাজ মহা ঝামেলার কাজ।

চায়না সকাল থেকেই দাপড়ে বেড়ায় তবু মনের সুখ পায় না। ধার গিন্নির মুখ ক্ষুরের চেয়েও ধার, কি কথায় মা-বাপ তুলে গাল দেয়। চায়না সব সয় কিন্তু মরা মায়ের কথা পাড়লেই সে কেমন ভ্যাবাচেকা খেয়ে ভীতু ইঁদুর ছানার মত তাকায়। প্রতিবাদ তার রক্তে নেই। ঘর ছাড়ার সময় তার বাপ সহদেব বলেছিল, বড়দের মুখে-মুখে তর্ক করিস নে। তোকে যেখানে রেখে গেলাম, সেটাই তোর আসল ঘর। মন দিয়ে কাজ করলে সকলের মন পাবি। মনে রাখিস মা, সকলের মন পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়

সহদেবের কথাগুলো কষ্টের দিনে ঠাণ্ডা দাওয়াইয়ের মত মেয়েটাকে জুড়িয়ে দেয় চায়নার। বাপ তার ভবঘুরে মানুষ কোথায় যায়, কোথায় শোয় তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই মা মারা যাওয়ার পর যে নেই তা নয় কিন্তু মেনকা ডোম বোস্টমির পর কেমন যেন হয়ে গেল সহদেব। বউয়ের শোকে সে তখন ভোলা মহেশ্বর ঘরের দিকে, কাজকর্মে কোন দিকে মন নেই। শুধু চায়নাকে নিয়েই তার সমস্যা। ঐ মেয়ের টানেই রাত-বেরতে ঘরে ফিরে আসতে হয় তাকে। না হলে পাড়া প্রতিবেশী দুষে, বলে-বউ গেল বলে কি মেয়েটাকেও হেলাফেলায় ভাসিয়ে দিবি। তুই না হয় বাউণ্ডুলে কিন্তু মেয়েটাকে তো মানুষ কর। তার তো ভবিষ্যৎ আছে।

দিন পেটে খাওয়া মানুষ, তার মেয়ের আবার ভবিষ্যৎ? সহদেবের চাপা হাসি এক সময় মুখ ফসকে আগুন ধরানো তুবড়ির মত বেরিয়ে আসে। নারাণবাবু বীরতলা প্রাইমারী স্কুলের হেড-মাষ্টার। তিনি বললেন, আমার সঙ্গে হাসবি নে। তুই নিজে মূর্খ বলেই কি মেয়েটাকেও মূর্খ করে রাখবি। সোজা কাল তুই ইস্কুলে আয়। আমি তোর মেয়েটাকে ভর্তি করে নেব। গাঁয়ের সবাই পড়ছে, তোর মেয়ে কেন পড়বে না।

—মেয়ে মানুষের আবার পড়া? কী হবে বাবু, ছাগল পিটিয়ে

লোক বানিয়ে আমার কি ক্ষমতা আছে বই-শ্লেট কিনে দিবার? সহদেবের মরা হাসিতে বুঝি বিষ ছিল, চকিতে রাগে জ্বলে উঠেছিলেন নারাণবাবু। আমি তোর কোন কথা শুনব না। যা বললাম তাই করবি। কথার হের-ফের হলে আমি আবার আসব। চায়নাকে নিয়ে যাব ইস্কুলে, দেখি তুই বাধা দেবার কে।

নারাণবাবু যা বলেন তা ভালর জন্যই বলেন। মূর্খ হলেও সহদেব সব বুঝতে পারে। চায়না বাসন্তীর ইস্কুলে ভর্তি হল, সহদেব একদিন তাড়ির ঠেকে না গিয়ে তার জন্য কিনে আনল শ্লেট-খড়ি। মনে ফুর্তি আর ধরে না। মেয়েকে আদর করে বলে, মারে, মন দিয়ে পড়বি। মাষ্টারবাবু বলেছে-তোরে বই-খাতা সব কিনে পয়সায় দেবে।

চায়নাও তার কোলা কোলা গালে টোল ফেলে বলে, বাবা গো, ইস্কুলে যেতে আমার খু-উ-ব ভালো লাগে। জান তো, আজ না মুড়ি দিয়ে ছিল ইস্কুলে। দিদিমণি বলেছে, কাল পাউরুটি দেবে।

চায়নার চোখে-মুখে আনন্দ। সেই আনন্দ সুতাসিক্ত কোন ভেলের মত ভেসে ফুটিয়ে পড়ে সহদেবের মুখমণ্ডলে। তাতে ধরা জীবনের উপর তার তখন কোন দুঃখ থাকে না। মেয়েকে কোলে বসিয়ে আদর করে বলে, পড়া-লিখা করলে তোরে আমি এট্টা ফুল ছাপা বাহারে পিরাণ কিনে দিব। লোভে-আনন্দে চকচক করে চায়নার চোখ, আধো স্বরে বলে, বাবা গো, আমি না অ-আ-ক-খ লিখতে পারি। দেখবা? বলেই গুমড়ে পড়ে মেঝেতে রাখা শ্লেটের উপর, তারিই পড়ুয়ার মত যত্নে লেখে—অ-আ চিকিবিকি আরও কত কি! সহদেব হাঁ করে দেখে, তার চোখে আশার ঝলকি।

বছরও গড়াল না, একদিন ভাঙা শ্লেট, পুরনো হয়ে যাওয়া বই বগল দাবা করে ঘরে ফিরে এল চায়না। বেজার মুখে সহদেবকে বলল, আমি আর ইস্কুলে যাব না। এখন আর ইস্কুলে কিছু খেতে দেয় না। আমার বড় ক্ষিদে লাগে। এত বেলা অব্দি ইস্কুলে থাকলে খালি পেটে আমার গা গুলায়।

সহদেব নির্বিকার হয়ে শোনে কথাগুলো, চাবুক মত কথাগুলো যেন তার গায়ের চামড়া চিরে দেয়। একটা মাত্র মেয়ে—তাকেও সময়মত দুটো খেতে দিতে পারে না সে। বাপ হওয়ার জ্বালা অনেক, আক্ষেপ-আক্রোশে হাত কামড়ায় সহদেব। যে মিস্ত্রির পেটই

ভরাতে পারে না, সে ভরাবে অন্য আরেকটা পেট। খাঁ খাঁ ক্ষুধে তীব্র খরা। শুকনো মাটির চেয়েও মানুষের মন এখন চিমড়ে, দয়া-মায়াহীন। দোর-দোর ঘুরলেও কাজের হদিশ মেলে না। আগে কাঁচা আনাজ নিয়ে বসত হাটখোলায়, এখন পুঁজি খুইয়ে সে ধান্দাও বন্ধ। চায়নার শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট শক্ত হয়ে হয়ে আসে সহদেবের, চোখের সামনে সে যেনকাকে মরতে দেখেছে বিনা চিকিৎসায়। চায়নার দড়ির মত রোগাটে শরীর বেঁধে ভয়ে আঁতকে ওঠে সহদেব। মেয়েকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলে, খালি পেটে পড়া-শুনো হয় না। তোর আর পড়ে কাজ নেই মা। চল, তোরে আমি রায় বাড়িতে পেট ভাতায় ঢুকিয়ে দিই। তারা মানুষ ভাল, তোরে পেটে পরতে দেবে। তোর এট্টা গতি হলে, আমি আর নিজেরে নিয়ে ভাবি না।

সাত-আট বছরের চায়না-তার রোগা লিকলিকে শরীর নিয়ে বাসন মাজে কলতলায়, রায় গিন্নি তার কাজের খুঁত ধরে বলেন, তোর দ্বারা কোন কাজ হবে না। এমন বাসন মাজিস যে দু'বার আমাকে ধুতে হয়। মন দিয়ে কাজ না করলে তোর বাবা আসলে চলে যাস। আমার এত পয়সা সস্তা নয় যে বসে বসে খাওয়াব।

চায়না কোনে, ছোট্ট চোখে-মুখে তার কোন প্রতিবাদ নেই। রায় গিন্নির মুখটা কড়া হলেও পেটে দেওয়ার সময় কার্পণ্য করে না। চায়না পেট ভরে খায়, দুপুরে খাওয়ার এক কোণে গুটিয়ে নিয়ে আবার নিজের কাজে মন দেয়। বেশির ভাগ দিনই মন ভাল থাকলে তার মুখে একটা গান শোনা যায়, চায়না বাসন মাজতে-মাজতে গায় থালা-বাটি-গামলা / কুকুরটাকে সামলা। হাতুড়ি-শেয়াল-কাস্তে / মা ঘুমোচ্ছে-আস্তে।

তার এই গানের কোন মাথা-মুণ্ডু নেই, তবু সে গায়, কেউ জিজ্ঞেস করলে হাসতে-হাসতে বলে, এ গানটা আমি ইস্কুল থিকে শিখেছি গো। জানতো আমাদের দিদিমণিটা কত সোন্দর-সোন্দর গান শেখাত! তার শেখানো সব গানগুলাই আমার মুখস্ত।

যার মুখে হাসি লেগে থাকে তাকে অবহেলা করা কঠিন। রায় গিন্নি কিছুটা সদয় হয়েছেন চায়নার উপর, উঠতে-বসতে তিনি এখন আর চায়নাকে গালি গালাজ করেন না। চায়নাও আগের চেয়ে ধীর-স্থির। সে হাতে হাতে টের পেয়েছে—এ বাড়ি ছেড়ে

গেলে হাত তুলিয়ে মারতে হবে অন্য দশ কাজ হলেও পারিশ্রমিক কষে তার সঙ্গে হয় না। সহদেব মাসে মাসে, পৌষে খবর নিয়ে চলে যায়। কিন্তু নিজের দুঃখ-দুর্দশার কথা মেয়ের কাছে সে আর মুখ ফুটে বলে না। পেটে ক্ষিদে, মুখে লাজ নিয়ে ফিরে যায় সে। চায়না দেখে, তারও তো কিছু করার নেই। দুঃখ হলেও তা হজম করে নেয় অতটুকু মেয়ে।

রায় বাড়িতে কাজের লোক দু'জন। বড় সংসার। দু'জন না হলে সব কাজ যথাযথ হয় না। চায়না হল বাড়তি কাজের মেয়ে। কেউ না এলে দায়িত্ব বাড়ে তার। না হলে অন্য সময় সে ছোট-বাবুর ছোট ছেলেটাকে আটকায়। ছোট গিন্নি সময় পায় না ছেলে ধরার। চায়নার কাছে ছেলে ধরিয়ে দিয়ে সে চলে যায় রান্নার কাজে। চায়না দিব্যি ছেলেটাকে পেলায়। কাঁদলে গান শুনিয়ে কায়দা ভোলায়। বাসন মাজার চেয়ে ছেলে ধরার কাজ যেন আরো সোজা। এ কাজটা চায়নার বড় পছন্দ।

সহদেব এল অনেকদিন পর, চেহারা উসকো-খুসকো, চোখ-মুখ শুকনো। চায়না দেখতে পেয়েছিল অনেকদূর থেকে কাছে এলে বলল, কেন এসেছ বাপ, তুমি আসলে গিন্নিমা বুব বেগে যায়। তুমি চলে যাওয়ার পর আমাকে বকাঝকা করে।

চুপ করে শোনে সহদেব। মাথা চুলকে এক সময় বলে, আজ সারাদিন কিছু খাইনি মা। দুটো কিছু থাকলে দে, খেয়ে বাঁচি।

চায়নার মুখে ভাবা সরে না। সে ভাঙ্গা বাবার মুখের দিকে তাকায়।

সহদেব বলে, আজ গিন্নিমার কাছ থিকে দুটা টাকা চেয়ে এনে দে। দোকানে গিয়ে কিছু কিনে খাব।

চায়না যেতে চায় না। কিন্তু সহদেব তাকে জোর করে পাঠায়। সব শুনে গিন্নিমা রেগে আগুন, টাকা! টাকা কোথায় পাব। দুই ছোট মেয়ে, কাজ করিস, খেতে দিই। তোর আবার টাকার কী দরকার।

চায়না মন মরা গলায় বলে, বাবা এসেছে। সারাদিন কিছু খায় নি।

তোর বাবা না খেয়েছে তো আমি কী করব? বিরক্তি ঝরে পড়ল গিন্নিমা'র গলায়। চায়না ফিরে এল ভগ্ন মনে।

সহদেব রায় বাড়ুজের পেয়ারা তলায় বসে ছিল। চায়না বলল, বাবা, তুমি একটু বস। আমি মাব-আর আসব।

নিজের ছেঁড়া-জামা প্যান্টগুলো গুছিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল চায়না।

গিন্নিমা রুষ্ট স্বরে বলল, কোথায় যাচ্ছিস অবেলায়?

চায়না খুব সহজভাবে বলল, বাবা এসেছে, আমি ঘর যাব।

—তুই ঘর গেলে বাসুকে কে দেখবে? তোর কাকিমার অসুখ।

—আমি যাবই। ছুটে বেরিয়ে এল চায়না। রায় গিন্নি তার পিছন পিছন এল, যাবি না বলছি। যা বাসুকে নিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আয়। ছেলেটা বড় কাঁদছে।

—আমি পারব না। আমি তোমাদের এ কাজ আর করব না। চায়না ক্ষোভের সঙ্গে বলল, বাবা সারাদিন কিছু খায় নি। আমি ঘরে থাকলে, মাকপাত খুঁটে এনেও বাবাকে খাওয়াতাম। তোমাদের এখানে থেকে আমার কী হবে। তোমাদের এখানে থাকলে আমার বাবাটা মরে যাবে।

চায়না মুখ নিচু করে বেরিয়ে এল রায় বাড়ির সীমানা। সহদেব অস্ফুটে বলল, যুগ বদলেছে। মা জননী, এবার নিজেদের একটু শুধরান।

সুস্থ সংস্কৃতি এবং প্রগতিশীল সাহিত্য
চর্চার হাতিয়ার 'সৃজন'কে
শারদ অভিনন্দন জানাই—

※※※
※※
※

শ্রীপাঁচকড়ি ভট্টাচার্য
প্রধান শিক্ষক

খুকুড়দহ আই. সি. এম. এম. উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
খুকুড়দহ ঃ মেদিনীপুর

বাজারের শব্দ

তুষার চট্টোপাধ্যায়

গতকাল দুপুর একটায় লোকেলবাবু এসেছিলেন। এর আগে কখনো তিনি আসেন নি। কালই প্রথম। আমি সবে স্নান সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়েছি, আর অমনি বাইরে থেকে কড়া নাড়ার ঝনঝন শব্দ! বাঁ হাতে মাথায় গামছা ফেলে জল মুছতে মুছতে আমিই দরজাটা খুলে দিয়েছিলাম। দুপুরের এই সময়টায় ইভা এবং মেয়েরা কেউ বাড়ীতে থাকে না। ওরা যে যার স্কুলে বেরিয়ে যায় সাড়ে দশটায়। আমাকে তার অনেক আগেই বেরিয়ে যেতে হয়। কিন্তু গতকাল ছিলাম। ইয়ারএণ্ডিং এর পাওনা দু'দিনের সি এল. নিয়ে বসেছিলাম ঘরে। দু'টো দিনের দিলাম

গতকাল সকাল থেকেই বাড়ীতে এর ওর আসা শুরু হয়েছিল। সকাল তখন ক'টা হবে! এই সাড়ে সাতটার মত। অঘোরে ঘুমোচ্ছিলাম লেপমুড়ি দিয়ে। সাধারণত এতো বেলা অব্দি আমার শুয়ে থাকলে চলে না। ন'টার মধ্যে আমাকে স্নান খাওয়া-দাওয়া করে অফিসে বেরিয়ে যেতে হয়। সকালে উঠেই চা খেতে খেতে খবরের কাগজে চোখ বোলানো। তার পরই বাগ হাতে দৌড়ানো বাজারে বাজার ফেলে দিয়েই বাথরুমে ঢুকে পড়তে হয় আমাকে। ন'টা সতের'র ভাবড়া লোকাল ধরতেই হয় আমাকে। পরশু গভীর রাতের একটা ইংরেজী টেলিফিল্ম দেখেছি টি. ভি. তে। বই দেখা শেষ করে বিছানায় উঠতে উঠতে রাত দুটো হয়েছিল। তা নিয়ে আমার কোন দুঃশ্চিন্তা ছিল না। বেশ মৌজাতে ছিলাম। কারণ পরপর দু'দিন সি এল। তার পরদিনই রোববার পড়ে যাওয়ায় পরপর তিনদিনের ছুটির আনন্দ পুরো মন প্রাণের বল নিয়ে ফেলেছে। পরশু অত রাত করে শুয়ে গতকাল একটু বেলা করেই ঘুম থেকে উঠেছিলাম। রোজকার তাড়াহুড়ো নেই। কিন্তু ইভা আমায় ডেকে দিয়ে বলল, 'বাইরের ঘরে কে একজন বসে আছেন, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন, খুবই নাকি দরকারি।' আমি অবাক না হয়ে পারি না। কে রে বাবা এই সাত সকালে খুবই দরকারি কাজকর্ম

নিয়ে এসে হাজির হয়েছেন ! কে হতে পারে ? নাঃ, আমি মনে করতে পারি না কে আসতে পারে। স্মৃতি হাতড়ে কারোর আসবার কথা মনে করতে পারি নি। চোখ মুখে রাজ্যের বিরক্তির রেখা ভাসিয়ে তুলে বাইরের ঘরে ঢুকতেই আগন্তুক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন, 'আমি সদানন্দ সরখেল, অশোকনগর থেকে আসছি। আপনি অফিসে বেরিয়ে গেলে দেখা পাবো না, তাই একটু সকালেই এসে গেছি। আপনাকে ডিস্টার্ব করলাম।' আমি মুখোমুখি সোফায় বসে সদানন্দ বাবুর সব কথা শুনে বললাম, 'আপনার ছেলেকে ভাল করে পরীক্ষাটা দিতে বলুন। ভাল ইন্টারভিউ দিলে কাউকে ধরাধরি করতে হবে না।' সদানন্দ বাবু এর পরও ওঁর সংসারের দুঃখ-দুর্দশার ফিরিস্তি শোনানো শুরু করলেন বিস্তারিতভাবে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আপনার ছেলের চাকরীটা হয়ে গেলে আমি নিশ্চয়ই খুশী হবো।'.....

গতকালের শুরুটা এভাবেই হয়ে ছিল তারপর এক এক করে আরো অনেকে এলো। যাদের আসবার কথা ছিল না, খুবই কম আসা যাওয়া করে, তারাও। বেলা সাড়ে বারোটা অব্দি লোকজন আসা যাওয়ার মধ্যে ছিল। সকলের সঙ্গেই কথা বলতে হয়েছে। ব্যাপারটা প্রত্যাশিত ছিল না বলে এভাবে একদিনের সি এল. বেকায়দায় খরচ হয়ে যাওয়ায় ঝুরঝুরে মন মেজাজ স্বভাবতই পিঁচিয়ে উঠেছিল। বাড়ীতে তো ইভা কিংবা মেয়েরা ছিল না। কাজের মেয়েটা আর আমি। হিসেব করে দেখেছি সকাল থেকে মেয়েটাকে ন'বারে বাইশ কাপ চা বানাতে হয়েছিল। যারা এসেছিল তাদের কেউই চা খাবে না কিংবা এই মাত্রই খেয়ে এলাম বলেনি। বাধ্যতঃ এদের সঙ্গে আমাকেও একটু একটু করে খেতে হয়েছে। সাড়ে বারোটায় লোকজন বেরিয়ে যেতেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে আমি বাথরুমে ঢুকে যেতে যেতে কাজের মেয়েটাকে শিখিয়ে ছিলাম, 'কেউ এলে বলবি বাবু বাড়ী নেই।' অথচ কলা নাড়ার মিনমিন শব্দ হতেই আমি নিজের হাতেই দরজাটা খুলে দাঁড়ালাম, আর রীতিমত অবাক হয়ে যাই লোকেশ বাবুকে দেখে।

লোকেশবাবু আমার অফিসে চাকরী করেন। আমি ওঁর খুবই প্রিয়-ভাজন। মানুষ হিসেবে নিখাদ ভদ্রলোক বলতে যা বোঝায় লোকেশবাবু তাই। অফিসে আমি ছাড়া ওঁর কোন বন্ধু নেই। আমি ঠিক

ওঁর বন্ধু নই। তবে বুঝতে পারি উনি আমায় খুবই পছন্দ করেন। সময় পেলেই আমার পাশে বসে গল্প করেন লোকেনবাবু খুব রাশভারি লোক। তবুই কণ্ঠস্বরে গোছ গাছ করে কথা বলতে পারেন। নকশাল বাড়ির জঙ্গী আন্দোলন বিনষ্ট হয়ে যাবার জন্য দুঃখ করেন, কারণ সৃষ্ট বিশ্লেষণ করেন। পুরনো দিনের ভুলভ্রান্তি শুধরে নিয়ে আন্দোলনটা আবার শুরু হওয়া উচিৎ বলে মন্তব্য করেন। এসব ওঁর নিজস্ব ভাবনাচিন্তা। নিজের বিশ্বাসের কথা আমায় বলেন। আমি মন দিয়ে ওঁর সব কথা শুনি। মাঝে-মধ্যে দু'একটা কথা বলি। এভাবেই তিনি ধরে নিয়েছেন যে, আমি ওঁর বিশ্বাসের অংশীদার, কাছের মানুষ। লোকেনবাবু আমায় বইপত্র এবং নানান জার্নাল পড়তে দেন। আমি পড়ি। ওঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করি। অথচ আমি কিংবা উনি কেউই কোন দিন কারোর বাড়িতে যাই নি। যাবার প্রয়োজন হয়নি। সেই লোকেন বাবু হঠাৎ করে এমন অসময়ে আমার বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে ডাক দেবেন ভাবতেই পারি নি। ওঁর উপস্থিতি আমায় হতচকিত করে দেয়। লোকেন বাবুকে ঘরে ঢুকিয়ে বসতে দিয়ে বললাম, 'আপনি এভাবে এসে যাবেন সেটা কিন্তু ভাবি নি। রিয়েলি এ গুড সারপ্রাইজ! কি ব্যাপার বলুন তো?' লোকেন বাবু সিগারেট ধরালেন। সিগারেটের প্যাকেটটা আমারদিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এমন না এলেও সন্ধ্যেয় আসতাম উইল ম্যাটার। অসময়ে এসে আপনাকে ডিস্টার্ব করলাম না তো?' লোকেন বাবুর কথা শেষ হতে পারে না। আমি হৈ হৈ করে উঠলাম। মনের যাবতীয় বিরক্তি গোপন করে এবং উনি এমন অসময়ে এলেও আমি যে খুশীই হয়েছি, তার নরম অভিব্যক্তি চোখ মুখের আদলে ভাসিয়ে তুলে বললাম, 'এসব আপনি কি কথা বলছেন লোকেন বাবু? আপনি এলেন আর আমি কিনা ডিস্টার্বড হবো? আপনি নিজে থেকেই এসেছেন, এটা তো আমার সৌভাগ্য। আমার বাড়িতে আপনাকে একদিন আসতে বলবো কতদিন ভেবেছি! আসলে একটা বড় রকমের সারপ্রাইজ দিলেন কিনা।' নিজেকে লুকোতে এসব কথা লোকেন বাবুকে বলতে বলতে হঠাৎ করে এমন অসময়ে লোকেন বাবুর বাড়িতে এসে হাজির হবার কারণটা ধরে ফেললাম। মাও জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের প্রস্তুতি চলছে দেশ জুড়ে। লোকেন বাবু নিশ্চয়ই এজন্য

কিছু আর্থিক অনুদান সংগ্রহের জন্যই এসেছেন। যার লাইন ধরে হাঁটে। সুতরাং আমার ধারণা ভুল হতে পারে না। লোকেশ বাবু বললেন, 'ম্যাডাম ঘরে নেই বুঝি?' আমি কাজের মেয়েটাকে চিনি ছাড়া আর এক কাপ চায়ের কথা বলে দিয়ে বললাম, 'ওর তো স্কুল।' লোকেশ বাবু নিজের হাত ঘড়িতে চোখ রেখে ভূমিকা না করে ওঁর আসবার কারণটা বলতে শুরু করলেন। বললেন, 'আসলে ঠিক এই সময়টায় আপনার এখানে আসবো সে রকম কোন পরিকল্পনা ছিল না। মিসেসকে নিয়ে সন্ধ্যেয় আসবো ভেবেছিলাম। আপনাকে না দেখলেও মিসেস আপনার গল্প শুনেছে। ওর খুব ইচ্ছে আপনার বাড়িতে আসে। আসলে মেলামেশাতো আর সকলের সঙ্গে হয় না!' আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'আরে সেটাতো দারুণ ব্যাপার। ইভা শুনলে খুব খুশী হবে। ম্যাডামকে আপনার নিয়ে আসা উচিৎ ছিল লোকেশ বাবু। যদিও ঠিক এই সময়টায় এলে আমাদের কাঁচা বাড়িতে ম্যাডামের ভালো লাগতো না। তবে ইভা বিকেল সাড়ে চারটের মধ্যে স্কুল থেকে ফিরে আসে রোজই।' লোকেশ বাবু বললেন, 'সে কথাটা আমিও ওকে বলেছি। তাতেই ঠিক হয়েছিল আজ সন্ধ্যেয় দু'জনে এখানে আসবো। কাঁদিন ধরেই ভাবছি আসবো। আসলে আসবো বললেই তো আর আসা হয় না! সবদিক সামাল দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরোনোটা একটা বিরাট ব্যাপার হয়ে পড়ে।' আমি বললাম, 'সেটা ঠিকই বলেছেন। হয়ে ওঠে না।' লোকেশ বাবু এরপর যে কথা শুরু করলেন সেটা আমার যাবতীয়, উৎসাহে, হাসি-খুশীতে বালতি বালতি জল ঢেলে দিল। আমার রক্ত হিম হবার জোগাড়। লোকেশ বাবুর মত মানুষও কিনা এমন সব অশ্লিল প্রস্তাব এবং আবদার পকেটে পুরে ঘুরে বেড়াতে পারেন সেটা আমার ভাবতে কষ্ট হয়।

এর আগে আমার ভগ্নিপতি, ছোট শ্যালক, অন্তরঙ্গ বন্ধুর এক শ্যালিকা: এক এক করে এমনই প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে এসে গেছে। কেউই আমার গলায় দড়ি না পড়িয়ে চলে যায় নি। এ ছাড়া রাস্তাঘাটে, অফিস, কোর্ট-কাছারিতে এইসব মানুষ-জনে ছেয়ে গেছে। নূতন কারোর সঙ্গে পরিচয় হবার পরই মানুষটার জীবিকার বিস্তারিত খবরাখবর জেনে শুনে আঁতকে উঠতে হয়। এরা সকলেই আমার বর্তমান নয়, আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশী চিন্তিত হয়েছে। আমার বর্তমানকে

উপেক্ষা করে ভবিষ্যৎকে ঝকমকে করে তুলতে বেশী মাথা ঘামিয়েছে, অজস্র পরামর্শ দিয়ে আমাকে বিব্রত করেছে। কেউ এল. আই. সি কেউ লিবারলেস, কেউ ওভারল্যাণ্ড, প্রিন্স ইত্যাদি নানান প্রতিষ্ঠানের যোগ্য প্রতিনিধি। প্রত্যেকেরই আপ্রাণ চেষ্টা আমার এবং অন্যান্যদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রদীপ জ্বালানো। চাকরী জীবনের শুরুতে অফিসের বড়বাবুকে খুশী রাখতে দু'একটা বড় অঙ্কের পলিসি করতে হয়েছিল। একবার ছোট শ্যালক এসে বলল, 'চাকরী-বাকরী তো আর হবে না জামাইবাবু. তাই এজেন্সীটা নিয়ে নিলাম, দেখি কিছু করা যায় কিনা।' তো আমাকে বলতেই হলো, 'খুবই ভালো প্রচেষ্টা। কিন্তু একটাতে লেগে পড়াটা খুবই জরুরী ব্যাপার। আমি এটাই চাই ছিলাম।' বলে ফেলেই বুঝলাম, আমি আবেগ বশতঃ যূপকাষ্ঠে গলা ঢুকিয়ে বসেছি। শ্যালক জামাইবাবুর দুর্বলতাটুকু বুঝতে পেরে মোটা অঙ্কের এক পলিসি করিয়ে নিয়ে গেল হাসতে হাসতে, অর্থাৎ আমাকে বিপন্ন করে।

কিছুদিন পর ভগ্নিপতি গঙ্গেন এলো। তার কারবার বন্ধ হয়ে গেছে এক বছরের উপর। বোন বুদ্ধি দিয়ে পাঠিয়েছে আমার কাছে, বন্ধু বান্ধবদের ধরে কয়েকটা কেস্ করিয়ে দেবার জন্য। গঙ্গেন এখন লিবারলেস করে সংসার চালাচ্ছে। তো অনিচ্ছা সত্ত্বেও তেতো বড়ি গেলার মত করে আমি একটা সই দিয়ে গঙ্গেনকে বিদায় করলাম। বন্ধুর শ্যালিকা ছন্দা একদিন এসে হাজির হয়ে গেল। ওভারল্যাণ্ডের এজেন্সী নিয়েছে ছন্দা। ছন্দা অবীর ঘুলিয়ে কথা বলতে জানে। কোন কথা বললে প্রৌঢ় জামাইবাবুকে কুপকাত করা যাবে তার যাবতীয় কৌশল ওর মুখস্ত। জানি এসব কথার কথা। বলতে হয় তাই বলা। তবু এতো দিনের একটা সুসম্পর্ককে দীর্ঘজীবী করতে ছন্দাকেও একটা সই দিয়ে দিতে হয়েছে। এভাবে আট দশটা পলিসি চালানোর বিড়ম্বনা নিয়ে বেঁচে আছি। এতোগুলো পলিসি চালাতে হিমসিম খাচ্ছি। রাস্তা ঘাটে নূতন করে কারোর সঙ্গে পরিচিত হতে ভয় হয় এখন। সর্বত্রই দেখি এইসব সফল প্রকল্পের গুণধর এজেন্টরা ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এদের ভয়ে এখন পালিয়ে বেড়ানোর জোগাড়। একদিন সুদিন নামে এক সহকর্মীর বেকার ছেলে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে আমার শরীর কেমন

আড়ে জানতে চাইল আমার উত্তর পাবার পরও নীরেনের কথার জাল বুনে চলল অনেকটা সময় ধরে। সুদিনের আচরণ আমাকে অবাক করে। এরপর একদিন রাস্তায় দেখা হতেই কবিতার একটা কোল্ডার আমায় ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'কাকু পড়ে দেখবেন, এর সব ক'টা কবিতাই আমার লেখা।' আমি ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারি না। নীরেনের ছেলে হঠাৎ করে এতোটা কাছে আসতে চাইছে কেন? ওর মুখে এতো কথা তো এর আগে কোন দিনই শুনিনি! আমার কোন অসুখ বিসুখ করে নি, তবুও ও হঠাৎ করে চিন্তিত একজন মানুষের মত আমার কুশল জানতে চাইছে, ওর লেখা কবিতা পড়াচ্ছে! একদিন জানতে চাইলাম, 'কি করছো আজকাল? নীরেনের তো আর বেশী দিন নেই!' আমার প্রশ্নের সব ক'টা শব্দ মুখের বাইরে না বেরোতেই ও কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে গুচ্ছের কাগজপত্র বার করে মুখে হাসির অজস্র রেখা ভাসিয়ে তুলে বলল, 'এল. আই. সি.র এজেন্সী নিয়েছি কাকু! দেখলাম চাকরী-বাকরীর ধান্দা করে লাভ নেই। তাই লেগে পড়লাম। এই ডিসেম্বরের মধ্যে তিন লাখ টাকার কেস দিতেই হবে। ও নিয়েই এখন রাতদিন পাগলের মত ঘুরছি!'.....

সুদিনের কথা শেষ হতেই আমি কিছু বলতে গিয়ে বিষম খেলাম। কাশতে কাশতে জলে আমার দু'চোখ ভরে গেল। একটু সামলে নিয়ে আর এক মিনিটও এখানে দেরি না করে মুখ ঘুরিয়ে যেতে যেতে বললাম, 'আর দেরি করতে পারছিনারে সুদিন! হাতে একদমই সময় নেই!' এইভাবে সেদিন সুদিনের পাড়া গাঁড়া থেকে বেরিয়ে আসতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি। জানি সুদিন আমায় ছাড়বে না। ছিনে জোঁকের মত আবারও ও ধরবে কোন একদিন। বলবে, 'জীবন সুরভি' দারুণ স্কীম, জানেন কাকু? বাপ মতো আমায় আবার ও ধরবে। ইভার স্কুলের কেরানীবাবু ইতিমধ্যেই ইভাকে দিয়ে দুটো পলিসি করিয়ে নিয়েছে। ওঁর স্ত্রীর নামে এজেন্সী। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারী মাস পড়তেই কেরানীবাবু ইভাদের মাথায় বড় অঙ্কের ইনকাম ট্যাক্স কেটে নেবার আতঙ্ক ঢোকাবে আর বলবে এর থেকে বাঁচতে একটা পলিসি করতে হবে। এসব বলে কয়ে কী বছর উনি ব্যবসা বাণিজ্য করে যাচ্ছেন। এভাবে প্রিমিয়াম জমা দিতেই আমার পকেট খালি হয়ে যাচ্ছে। সংসার

চলে না। কী মাসে টানাটানি, এভাবে কতদিন করে চলতে হচ্ছে; এরপর সংসারটা চলবে কি করে? তার সমাধান কিভাবে হবে সে ব্যাপারে কোন পরামর্শ পাওয়া যায় না। বর্তমান নয়, সকলেই ভবিষ্যৎটাকে উজ্জ্বল করে তুলবার স্বপ্ন দেখায়। রাস্তা ঘাটে, হাটে-বাজারে, অফিস কোর্ট কাছারিতে সাধারণ লোকের চাইতে এমন সকল প্রকল্পের ছিনে জোঁকের ভিড় বেশী।

সেদিন সোদপুরে এক পুরনো বন্ধু কুমুদ মণ্ডলের বাসা বাড়িতে গিয়েছিলাম বেড়াতে। কুমুদ আমার প্রাইমারী স্কুলের বন্ধু। পূর্বস্থলী অন্নদাশঙ্কর প্রাইমারী স্কুলে আমি এবং কুমুদ পড়াশুনা করেছি। কুসুম ফ্যাক্টরীতে চাকরী করতো কুমুদ। সেই কুসুমে তিন বছরের উপর হলো তালা ঝুলছে। শ্রমিকদের নিদারুণ অবস্থা। অনেকদিন কুমুদের ওখানে যাওয়া হয় না। একবার যাওয়া উচিৎ ওর খোঁজ খবর নিতে। এই ভেবে একদিন সন্ধ্যায় ইভাকে সঙ্গে নিয়ে কুমুদের বাড়ীতে গেলাম। কুমুদের বাড়ীর বাইরে একটা বাক্তাক দাঁড় করানো ছিল। ভিতরে ঢুকে দেখি কুমুদ বাইরের দেরা বারান্দায় একজন ফিটফাট ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছে। চোখের ইশারায় কুমুদ আমাদের ভিতরে যেতে বললো। আমাদের হঠাৎ করে দেখে শিখা উচ্ছল হয়ে উঠলো। বলল, 'ওমা অসিতদা আপনি মনে আছে তা হলে? কতদিন আসেন না বলুন তো? আজই ওকে বলেছি আপনাদের কথা।' আমি শিখার অভিযোগকে ফেলতে পারি নি। ঠিকই, অনেকদিন ওদের খোঁজ নিতে আসা হয় না আসলে ইচ্ছে থাকলেও আজকাল আর হয়ে ওঠে না। বললাম, 'তোমাদের সব খবরই রাখি, বাদলের সঙ্গে তো দু'একদিন পরপরই দেখা হয়, ও তোমাদের সব খবর দেয়।' এইভাবে বসে বসে শিখার সঙ্গে গল্প করছি। কুমুদের ফ্যাক্টরীর খবর নিই। কিভাবে ওদের চলছে? ওদের বর্তমান নিয়ে আমরা খুবই চিন্তিত। একটু পরে শিখা উঠে গিয়ে প্লেট সাজিয়ে দু'তিনটে করে মিষ্টি, চপ-সিঙারা নিয়ে এলো। একি! শিখা এসব কি পাগলামো শুরু করেছে! আমি এবং ইভা হতভম্ব হয়ে গেছি ওর আতিথেয়তার বহর দেখে। এমন দুর্দিনে শিখা এসব না করলেই বরং আমরা খুশি হতাম। শিখার এমন পাগলামো আমাদের কুণ্ঠিত করে তুলেছে। ইভা সঙ্কুচিত। এসব

কিছুই প্রয়োজন ছিল না বোঝাতে গেল ও অমনি শিশু সেন্টিমেন্টাল হয়ে বলল, 'কতদিন পর এলেন বলুন তো? ফ্যাক্টরী বন্ধ তো কি হয়েছে? এখান থেকে একটা মিষ্টিও ওঠানো চলবে না!...

কুমুদের সঙ্গে যিনি এতোক্ষণ কথা বলছিলেন, তিনি কথা শেষ করে উঠে দাঁড়াতেই কুমুদ আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'অসিত সামন্ত, আমার ল্যাংটোকালের বন্ধু।' আমি হাত জোড় করে প্রতিনমস্কার জানিয়ে ভদ্রলোককে বললাম, 'কুমুদের সঙ্গে একদিন চলে আসুন আমার বাড়ী। ভাল লাগবে আপনার।' ভদ্রলোক বললেন, 'নিশ্চয়! একদিন যাবো, আমি গল্প করতে খুব ভালবাসি। কুমুদের কাছে শুনেছি আমার মত আপনিও গল্পবাজ মানুষ।' বলেই ভদ্রলোক ঘরাজ গলায় হো-হো করে হেসে উঠলেন। আমি ওর হাসির সঙ্গে হাসি মিশিয়ে বললাম, 'ব্যাস ওই টুকুই তো, একটু প্রাণ খোলা গল্পগুজব। এসব তো এখন বিরল ঘটনা। মানুষের জীবনে নেই বললেই চলে, কি বলেন?' ভদ্রলোক বাজারে স্টার্ট দিতে দিতে বললেন, 'দেবি করবো না, দেখবেন এর মধ্যেই একদিন চলে গেছি আপনার বাড়িতে!' আমি গলা চড়িয়ে বললাম, 'অপেক্ষা করে থাকবো, দেখবো কেমন কথার দাম!' এর পর কুমুদ ভিতরের ঘরে এসে আমাদের সামনে বসতে বসতে বলল, 'এল. আই. সি'র ফিল্ড অফিসার, বীজপুরে থাকেন। আমাকে খুব স্নেহ করছেন। উনি না থাকলে এতো দিনে সপরিবারে ছাওয়া হয়ে যেতাম!' চমচমের একটা টুকরো গলায় চালান করে দিতে গিয়ে আমি বিশ্রী রকমের বিষম খেলাম। কুমুদ বলল, 'আরে আস্তে খা। অমন হড়বড় করছিস কেন? সবে তো সাড়ে সাতটা, আর কোথাও যাবি না কি?' কাশতে কাশতে আমার দু'চোখ জলে ভরে গেল। একটু সামলে নিয়ে কুমুদের দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইলাম। ও বলল, 'আপাদ মস্তক নিখাদ জেন্টলম্যান যাকে বলে অশোক রাহা ঠিক সেই মানুষ।' আমি কষ্ট করে উচ্চারণ করলাম, 'অ।' এই ছোট্ট 'অ' উচ্চারণ করতে গিয়ে দেখি আমার গলা দিয়ে অচেনা কিছু অর্থহীন শব্দ বেরিয়ে গেল। যার অর্থ আমি নিজেই বুঝি নি।

সেদিন থেকে আমি আজকে দিন গুণছি। অলোকবাবুকে সঙ্গে করে কুমুদ যে কোন দিন এসে যাবে বাড়ীতে ঠাণ্ডিয়ে দাঁতো-আরোহীয় গল্প।

কালের বন্ধুত্বের দাবী নিয়ে। গল্প বলতে তো ওই 'আলাপীপ', 'জীবন স্বরডি'র গুণ কীর্তন। নিজের মূর্খামির জন্য দিনরাত আপন মনে নিজেকে ভৎর্সনা করে চলেছি। আলাপ পরিচয় হওয়া মাত্রই মানুষকে মানুষের বাড়িতে ছুটতে হবে? আর অশোকবাবুও অদ্ভুত মানুষ। বলা মাত্রই ক্যাচটা লুফে নিলেন। এদের সঙ্গে কথায় পারা যায় না। একবার এসে বসলে গালি হাতে ওঠানো মুস্কিল। এইসব দুশ্চিন্তার জালে জড়িয়ে নিজের বোকামির যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছি, যখন এই সবের আগুনে ঘি ঢেলে জলছি, ঠিক সেই সময়টায় লোকেশবাবুর আগমন। ভাবা যায় না এসব। এরা সকলেই আপনজন, প্রিয়জন, দূরের কেউ নয়। কেউ গালি হাতে চলে যাবার জন্য আসে না। আমি তো লোকেশবাবুকে এতোদিন অন্য জগতের মানুষ বলেই জেনে এসেছি। ওঁর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানান গল্পে মাতিয়ে রাখা যায়। লোকেশবাবুর মত মানুষের কাছ থেকেও যে কোনদিন এমন সব বিপদগুলো এগিয়ে এসে আমায় বিপন্ন করে তুলতে পারে সেটা ভাবতে পারিনি।

আমি হতবাক হয়ে গেছি লোকেশবাবুর এ্যাপ্রোচ শুনে। মনে হচ্ছে লোকেশবাবু এ লাইনে নূতন কেউ নন, বেশ পুরনো, পোড়খাওয়া! এখন আমি কিভাবে লোকেশবাবুকে আমার ভিতরটা দেখাবো, আমার অক্ষমতার কথাটা বোঝাবো যে আমি এখন আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে নয়, বর্তমানই আমার জীবনে এখন একটা বোঝা! আমি আমতা আমতা করে আমার সমস্যাটা বোঝানোর জন্য কিছু কথা বলতে গেলে লোকেশবাবু মাঝপথে আমায় থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আসলে আপনাদের বৌদি, মানে রেখা, ওই রেখাকে কেবারিটের এক দুঁদে ফিল্ড অফিসার এসে কায়দা করে ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে। এখন আপনার বৌদির এজেন্সী সামলাতে রাজ্যের ছাপা আমার মাথায় চেপেছে!' লোকেশ বাবু থামতেই আমি বললাম, 'ভবিষ্যতের জন্য তো এসব ব্যাপার গুলো করেই সেরে ফেলেছি লোকেশবাবু! আর তা ছাড়া আমি তো দু'হাজার একে বসে যাবো। হাতে গোনা কয়েকটা বছরইতো মাত্র বাকী! বৌদি বড্ড দেরি করে ফেলেছেন এজেন্সীটা নিতে। আমার খুব খারাপ লাগছে এভাবে আপনাকে ফেরাতে অথচ আপনার সঙ্গে আমার অন্য ধরণের সম্পর্ক। উপায় থাকলে—

লোকেশবাবু আমায় থামিয়ে বললেন, তা আর কি করা

না? আমি তো আপনার এটুকুও জানি। আপনার বৌদি আপনার-আমার মধ্যেকার সুসম্পর্কের মই বেয়েই উঠে এসেছে এতোটা। ও বার বার করে বলেছে, 'অসিতদাকে বিব্রত করবে না, ইভাদির চাকরি এখনো তের বছরের উপর, 'আশাদীপ'-টাই ইভাদির জন্ম বেটার হবে।' এই অব্দি বলে লোকেশবাবু একটু থামলেন। আমি আবার ও বলতে গেলাম, 'এসব আর কোন মতেই সম্ভব নয় লোকেশবাবু,' কিন্তু আমার সব কথা শেষ করতে না দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তাহলে ঐ কথাই রইল অসিতবাবু, আজ সন্ধ্যায় আমরা দু'জন আপনার বাড়ীতে আসছি। ম্যাডামকে বলবেন আমাদের আসবার কথা।' আমি বুঝতে পারছি লোকেশবাবু পাকা এজেন্টের মতো কথার জালে আমায় জড়িয়ে ফেলতে চাইছেন আমি পরক্ষণে অব্দি লোকেশবাবুকে এগিয়ে দিয়ে সামান্য হেসে বললাম, 'বৌদিকে নিয়ে বেড়াতে আসবেন আসুন, উনি কোনদিন আমার বাড়িতে আসেন নি আজই প্রথম শুনে ইভা খুবই খুশী হবে।'

লোকেশবাবু আমার কথার পিঠে নূতন কোন দারালো চাল চড়াতে চাইলেন। আমি ওঁকে সে সুযোগ না দিয়ে বললাম, 'বৌদির সঙ্গে আজই হবে প্রথম দিনের আলাপ পরিচয়। প্লীজ, শুধুই বেড়াতে আসবেন আজ। ব্যবসা-বাণিজ্যের অপ্রিয় কথাবার্তা গুলো অন্ততঃ প্রথম দিনেই সঙ্গে করে আনবেন না। আপনাদের জন্য আমাদের প্রতীক্ষার আনন্দটুকু নষ্ট করে দেবেন না

লোকেশবাবু অনেকটা এগিয়ে গেছেন ততক্ষণে। মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'এজেন্সীটাতো রেখার, এর পরের কথাগুলো ওর সঙ্গে হওয়াই ভাল।' বলেই উনি হো হো করে হেসে উঠলেন। চড়া গলায় হাসির রেশ কমিয়ে আনতে আনতে তিনি বললেন, 'আমাদের মধ্যেকার সম্পর্কটা আরো বেশী বিশ্বস্ত হয়ে উঠুক শুধু এটুকুই চাইছি। আপনি চাইলে আটকাবে না, হয়ে যাবে!'

———

ছাল চামড়া

চিন্ময় দাশ

গোটা রুইদাস পাড়াটা ভেঙে পড়েছে উঠানে। পাশাপাশি মৃতা ভূমিজদের বউঝি'রাও ভীড় করেছে এসেছে। দাওয়ায় খুঁটিতে ঠেস দিয়ে ঝিম মেরে বসে আছে পবন। মুখে রা-টিও সরছে না তার।

পবনের পাশেও বেশ ক'জন। ঘিরে আছে তাকে। নানান কথাবার্তা তাদের। কেউ সান্ত্বনা দিচ্ছে। কেউ আশ্বাস, সাধ্যমত সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি।

কিছুই কানে যাচ্ছে না পবনের। পাথরের মত বসে আছে মানুষটা। কখনও কখনও মানুষের এমন হয়। এত কোলাহলের, একটা বর্ণও শুনতে পাচ্ছে না সে। উঠোন, দাওয়া, ঘর ভর্তি হয়ে গেছে প্রতিবেশী আর জ্ঞাতি মানুষের ভীড়ে। কিন্তু পবনের নিজেকে নিঃস্ব মনে হচ্ছে দুনিয়াতে যত একলা হয়ে পড়েছে সে যেন।

ঠিক এমনটা হয়েছিল আগেও একবার। সেই যখন তার আগের বৌটা চলে গেছিল। কোথাকার কে একটা বালি গাড়ীর হেল্পার। কোথাও কিছু নেই। হঠাৎ একদিন তার সাথে চলে গেল!

গরম পড়লে, বালি গাড়ীর আনাগোনা বাড়ে। সেই গরম যত বাড়ে, আনাগোনাও বাড়ে গাড়ীর। নদীর বুক জুড়ে ধূ ধূ সোনা রং-এর বালির সমুদ্র। বালি সরিয়ে সরিয়ে গর্ত খুঁড়ে পাথার জল আনতে যায় গ্রামের মেয়ে-বৌরা।

শাল মহুলের জঙ্গল কেটে ট্রাক চলাচলের গভীর রাস্তা। গরমের দিনে সারা দিন রাত ভারী ট্রাকের তীব্র গর্জন। একদিন জল আনতে গিয়ে আর ঘর ফেরেনি পবন রুইদাসের বউ। গাঁয়ের মেয়ে বউদের কাছে জেনেছিল পবন, ছেলেটাকে নিয়ে একটা ট্রাকে চড়ে বসতে দেখা গেছে তাকে।

সেদিন এমনই সোনা আর নিঃসঙ্গ মনে হয়েছিল পবনের।

তার বুড়ি মা-টাই তাকে বাঁচিয়েছিল। পাখীর ছানার মত সবসময় ডানার আড়াল করে রক্ষা করেছিল অতবড় পবনকে।

আবার যে পবনের বৌ হোল, আবার যে পবন ঘর-সংসারে মন দিল, তাও তো বুড়িটার জন্যই।

—আমি তোকে কতদিন দেখব পবনা! তোর বুড়া মা-টো একদিন মরি যাবে। সেদিন কী হবে তুহার?

আজ পবনের সেই বুড়া মা মরেছে। উঠান-ঘর ভর্তি পঙ্গপালের ভীড়। বোধবুদ্ধিহীন পাথর বনে বসে আছে পবন। এবার তার কী হবে? একদিন এই ছোট বউটাও হয়ত দুপুরে কোন একটা ভিনদেশী ট্রাকে উঠে, চলে যেতে পারে। সেদিন পবনের কী হবে?

বুড়ীটাকে দোলা উঠানে শের করে রাখা হয়েছে। একটা ছেঁড়া শীতলপাটির ওপর। আকাশের দিকে মুখ করা। কাঠ, বাঁশ জোগাড় করতে জঙ্গলের দিকে গেছে লোকজন। পাটুলি না বাঁধা পর্যন্ত বুড়ীটাকে ঘরেই রাখতে চেয়েছিল পবন।

হাঁ হাঁ করে উঠল লোকে। ঘরে পোয়াতি বউ। মড়া রাখা যায় সেখানে?

তার মা-টা এখন মড়া হয়ে গেল। আর, এই বউকে তো মা-ই জোগাড় করে এনেছিল। 'আমার লাতি হবে মোর'বলে বুড়ি কত আহ্লাদ করত। সেই মানুষটা আজ ক্ষতি করবে নাকি পোয়াতি বউয়ের!

পবন বলতে পারেনি কিছু। বুড়ীটা তাই উঠোনে শুয়ে আছে।

—হাম্বা।

সম্বিত ফিরল পবনের। খুঁটি ছেড়ে উঠে, ঘরের পেছন দিকে গেল সে। সকাল থেকে এক আঁটি বিচালিও পায়নি গরুটা। কারও মনেই ছিল না প্রাণীটার কথা।

যার মনে থাকত, সে এখন নির্বিকার শুয়ে আছে চাটাইয়ের শয্যায়। বেলা বাড়লে, হাঁক পেড়ে বলবে মা—বউ, চাট্টি পান্তা দে, খিচি। আমি গরুটাকে এক আঁটি খড় দিয়ে, আসছি।

খড়ের আঁটির গিঁট আলগা করে দিল পবন। মা বলত—অবধ পেরানি। আঁটি খুলে না দিলে, খেতে পারে না পশুটা। শুধুশুধু খড় নষ্ট হয় কত।

খড় দিয়ে, গরুটার গায়ে, গলায় হাত বুলায় পবন। নরুনাটা

পোয়াতি হয়েছে কিছুদিন হোল। সেজন্যই আরও বেশী করে যত্ন করত তার মা।

—আমার লাতি দুধ খাবে। এক ছটাক দুধ কাউকে দুবনি। সব আমার লাতি খাবে।

পবনের বউ লজ্জা পেত। হাসত। তবু হাসি মুখেই বউ বলত—সব তুমার লাতি খাবে, গাইটা কি খাবে? উয়ার ঘোল কুথি আইসবে কুথেকে?

গরুটার গায়ে হাত বুলায় পবন। নরম মখমলের মত তেলতেলে শরীর। সারাদিন গরুটার দেখভাল করত তার মা। এখন এর কি হবে? বউএর শরীর তো ভারী হয়ে আসছে। প্রথম থেকেই তাকে বড় একটা বাইরে বেরোতে দেয় না পবন। বদের বা মাঠের সুলুক সন্ধানও বউটার জানা নেই। এই গরুর উপযুক্ত দেখভাল কী করে হবে?

পবনের তো কাজকর্মের ধান্দা আছে। মানে, আসলে তার নির্দিষ্ট কাজকর্ম নেই কিছু। জাতে সে মুচি। কিন্তু জাত ব্যবসার আর কতটুকুই বা অবশিষ্ট আছে। চামড়ার যদিও, পাম আছে বেশ ভালোই, গরু আর পড়ছে কোথায় ভাগাড়ে। একে তো লোকজন আগের মত আর গরু-মোষ পোষে না। তার উপর কাঁধে ব্যাগ চাপিয়ে, সরকারী লোকেরা ঘুরে বেড়ায় গাঁয়ে গাঁয়ে। কিছু হলেই খুঁই দেয়, ঔষধ দেয়। পবনের মাথায় রক্ত চড়ে যায়-লোকগুলানকে দেখলে। আরে বাপু, গরু-বাছুর মরলে তোদের ক্ষতি কি?

কখনও একটা ঢাক বা মাদল তৈরীর কাজ জুটে যায়। কিন্তু সে তো কালে ভদ্রে। সে কাজ পেলে অবশ্য হাতে দুটো পয়সা থাকে পবনের।

বউ-এর পেটে বাচ্চাটা বাড়ছে প্রতিদিন। তার জন্যও খরচা আছে। সেই ধান্দায় বেরুতে হবে পবনকে। তখন এই গরুর কী হবে! কী দুর্দশাই যে আছে কপালে।

দিনকয় আগের কথা। পবনের মায়ের জ্বর। উঠতে পারে না। পবন ঘরে ছিল না। গরুটা খিদের টানে দড়ি ছিঁড়েছিল বোধ হয়।

খিস্তেলে মহাপাত্রবাবুর সে কি রোয়াব! পবনের ঘরের সামনে এসে তড়পাতে লাগলেন—ব্যাটা মুচি, মুচির মত থাকবি। এক

গোছ' হিচকি নাই হবে, আবার গরু পোষার কথা তোর কম বলতে তো মরা গরুর ছাল ছাড়ানো। সারাদিন শকুনের মত ভাগাড়ে চোখ সেঁটে বসে আছিস। ছ্যাদ্দ গরুর মর্ম তুই কী বুঝিস? চামার কোথাকার!

একটু দম নিয়ে বলেন—চল, আমার কুমড়ো বাগানের হালটা কী হয়েছে একবার দেখে আসবি, চল।

সাদা সিধে শান্ত মানুষ পবন। কী ভেবে, শুধু মুখ করে বলে ফেলেছে—বাবু, আমার গরুটাই কী -

চিৎকার করে ওঠেন মহাপাত্রবাবু—চাবকে তোর পিঠের চামড়া তুলে নেব, হারামজাদা। আমার হাজার টাকার বাগান নষ্ট করে, আবার অস্বীকার করছিস। যা, এবার ছাড়িয়ে আন সাধের গরুকে। পঞ্চায়েতের খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে দিয়েছি।

ধারুকর্জ করে গরুটাকে ছাড়াতে হয়েছিল সেবার। আর পনের দিন মাগনা খেটে দেবার কড়ার করতে হয়েছিল মহাপাত্রবাবুর সব্জি ক্ষেতে।

এখন সেই গরুর দেখাশোনা করা পবনের একটা দুশ্চিন্তা হয়ে দাঁড়াল।

সামনে থেকে ডাক পড়েছে। আর একবার গরুর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে, ফিরে যায় পবন। কতক্ষণ গরুটার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, তার খেয়াল নেই।

পাটালি বাঁধা শেষ। ছেঁড়া শীতলপাটিটা বিছিয়েই, তার উপর শোয়ানো হয়েছে মড়াকে। কাঁধে তুলে বেরিয়ে যাওয়ার আগে কিছু নিয়ম কানুন।

পবন নিস্পৃহভাবে দেখছিল সবকিছু। কিন্তু যখন বড় একটা পেরেক এনে, কুড়ুলের ঘায়ে চৌকাঠে পুঁতে দিতে গেল একজন, পবন আর স্থির থাকতে পারল না। যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এই বিশ্বাস। সংস্কারের স্রোতে এই বহমান জীবন নির্বাক পথিক।

মৃত মানুষের প্রেতাত্মা ঘরে ফিরে গৃহবাসীদের কোনও অনিষ্ট করতে না পারে, সেই প্রত্যাবর্তনের পথ রুদ্ধ করতেই চৌকাঠে পেরেক পোঁতার নিয়ম।

এই বুড়ী মা, পাখি মায়ের মত আগলে রাখত পবনকে, পবনের সুখের জন্য যোগাড় করে দিয়েছে এই কৌটোকে, কৌয়ের শারদীয় গল্প

পেটের বাচ্চাটাকে গিলে ছিল তার কত সাধ স্বপ্ন—তাও তাদের কোনও ক্ষতি করতে পারে বুড়িটা?

ছিটকে গিয়ে, পেরেকটা টান মেরে তুলে ফেলে দেয় পবন।

—'আম ভুখা। আমার ঘোর মুহানে পেরেক পুঁততে হবেনি। কুন ক্ষতি করবে নি মা আমাদের। খাটুলি তুল, শ্মশানে চ।'

পবনটা চিরকালই মা অন্তপ্রাণ। যে মা মরে গেছে, তাকে ও ছোট ভাবতে পারে না। বুড়িটা সংসারের কোন ক্ষতি করবে, এই ভাবনা তাকে পাগল করে দেয়। লোকেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। তারপর কোন প্রতিবাদ না করে কাঁধে খাটুলি তুলে নেয়। যার ঠেলা সে বুঝবে। তখন কিছু বলে, আমাদের তো আর ভুগতে হবে না। শ্মশানের পথে পা বাড়ায় সবাই।

ব্রাহ্ম-শান্তির পরচ আছে। একটা পয়সা হাতে নেই পবনের। অনেক ভেবেচিন্তে মহাপাত্রবাবুর দরজায় এসেই দাঁড়াল পবন।

—তোকে তো বলেছিলাম পবনা, গরু-বাছুর পোষা তোর কম্ম নয়। গরুটা সিক্রি করে দে। হাতে পয়সা এসে যাবে। তোর মায়ের কাজকর্ম মিটে যাবে! একটু হিসেব করে পরচা করলে, চাই কি তোর পেঁয়াজের দারকর্চ চুকিয়ে, হাতে দুটো পয়সা থেকেও যাবে।

শিউরে ওঠে পবন। বাবু বলে কি? শেষ পর্যন্ত গরুটা হাতছাড়া করতে হবে?

পবনকে ঘাড় গোঁজ করে থাকতে দেখে, বাবুর মুখে একটু হাসি ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল। পবন তা দেখতে পায় না।

তুই সন্দেহের চিন্তা করছিস? ঠিক আছে আমিই না হয় নিয়ে নেব। কী আর করা যাবে। যদিও সাত সাতটা গরু আমার গোয়ালে। দাম তোকে ন্যায্যই দেব—বাগে পেয়ে ঠকাব না।

পবন নিরুত্তর দাঁড়িয়ে থাকে। তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। বাচ্চা হতে বেশী দেরী নেই গরুটার। এখনই সেটা হাত ছাড়া হয়ে যাবে!

পুরানো কথা মনে পড়ে পবনের। এই তো দিন কয়েক আগে। জঙ্গলে গাছ কাটা হয়েছিল। বিটবাবুর হাতে পায়ে ধরে, একটা কাঁঠাল গাছের গুঁড়ি চেয়ে নিয়েছিল পবন। দুদিন ধরে খোঁড়াখুঁড়ি করে গুঁড়িটা তুলেছিল। বাতলি দিয়ে, সেটা থেকে তাকের পোল বানাচ্ছিল সে। একটানা গোবর হাতে গরুটার পাশে ঘুরঘুর করছিল

তার মা। হঠাৎই হাতের গোবরের তালটা গরুর পেটে চেপে দিল বুড়ি।

পবন বলে—কী করছিস তুই?

—বাছুরের মাথায় সাদা চাঁদ হবে, দেখবি।

এখন বাছুর নিয়ে মেয়ী নেই। গরুটা হাত ছাড়া হয়ে যাবে মায়ের শ্রাদ্ধের জন্য। পবনের ভেতরটা উথাল-পাথাল হতে থাকে।

চুপ করে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পবন।

মহাপাত্রবাবু চালাক লোক। বলেন—ঠিক আছে, এক কাজ কর। ওপারে আমার বোলকাঠা জমি আছে একটা। ঝোপ-ঝাড় হয়ে আছে ঢিবিটা। গাছপালা পরিষ্কার করে, হালিল করে দে জমিটা। টাকা নিয়ে যা, সবন সুবিধা হলে ফেরত দিস্।

পবনের মুখে আলো খেলে যায়। যাওয়ার সময় মাটিতে গড় হয়ে প্রণাম করে।

—শোন, কুমড়ো ক্ষেতের দরুন পুরো পনের দিন দেটে দিতে হবে। সেটা ভুলে যাস না।

—না বাবু। আমি করে দেব সব।

ঘরে একটাও দানা নাই। গরুটারও মনে হয় কিছু হয়েছে। খাচ্ছে না কিচ্ছু। মুখ দিয়ে তার ফেনা বেরুচ্ছে। এই পোয়াতি অবস্থায় গরুটা যদি মরে যায়, পবন তাহলে অকূলে পড়বে। ভোরবেলা আসার সময় গরুটাকে সে দেখে এসেছে ভালো ঠেকে নি তেমন।

নদী পেরিয়ে মহাপাত্রবাবুর জমি। আটদিন হলো কাজ করছে পবন। সন্ধ্যারাতে ফেরার পথে, বাবুর কাছে যায়। কাজের কিস্তিটি দেয়। এক আধ পাই চাল, মুড়ি চেয়ে চিন্তে আনে।

কতদিন ভাগাড়ে যায়নি পবন। গরু কিংবা মোষ একটা পেয়ে গেলে, সে বেঁচে যেত। চামড়ার এখন ভালো দাম। বৌটাকে একটু ভালোমন্দ খাওয়াতে পারে। গরুটারও চিকিৎসা করা যায়।

আশায় আশায় থাকে পবন। প্রতিদিনই চাকুটা সঙ্গে রাখে পবন কাজে যাওয়ার সময়। কাজের ফাঁকে ফাঁকেই চোখ তুলে দেখে আকাশের দিকে। দেরীতে দেখলে, আগেয়ের লাভ নেই। আফসোস করতে হবে। অন্য কেউ এসে হাত লাগিয়ে দেবে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। একটা বিড়ি ধরাবে বলে, কোদাল রেখে বসেছে পবন। হঠাৎ দেখতে পেল কিছুটা।

চোখদুটো বন্ধ করে, দৃষ্টিটাকে আকাশে ছড়িয়ে দিল পবন। ঐ তো, যা ভেবেছিল তাই। আরও একটা। ঐ তো একটা আবার। দু'টো চারটে করে জমতে লাগল। গোল হয়ে ঘুরতে লাগল চক্রাকারে। আকাশের অনেক উঁচুতে ক্রমশঃ বড়ো হতে লাগল কালো বৃত্তটা। অনেক উঁচু থেকে ভাগাড়ের ছবি দেখতে পায় শকুনেরা।

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে পবন। বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। একদলা থুতু ছিটিয়ে, হাঁটতে শুরু করে।

পা টেনে টেনে নদীর বালি পেরোয়। গাঁয়ে ঢোকার পথ বাঁয়ে রেখে, আলপথ ধরে এগিয়ে যায়। শ্মশান পেরুলেই উঁচু ডাঙা জায়গাটা। শুকনো নাড়ি, জানোয়ারের হাড়গোড় দু'একটা। আজকাল হাড়গোড়ও ভালো দামে বিক্রোয়। বস্তাবন্দি করে কুড়িয়ে নিয়ে যায় লোকে। হাড়গোড় বড় একটা পেলে গায় না ভাগাড়ে।

পাড়াই বেয়ে ওপরে উঠে যায় পবন। অনেক নীচে নেমে এসেছে শকুনের চক্রটা। ভোজের সময় হয়ে গেছে তাদের। শুধু পবনের আধঘণ্টা কাজের অপেক্ষা।

ঢালের ওপাশে পড়ে ছিল জন্তুটা। দু'জোড়া পায়ের বাঁধন খুলে বিচালির দড়িটা ফেলে গেছে লোকেরা। সেদিকে তাকাতেই সম্বিত হারিয়ে ফেলে পবনের। একে নিয়েই স্বপ্ন দেখেছিল তার বুড়ি মা। এর জন্যই আশায় বসে আছে পবন। এর জন্যই পরের জমিতে বেগার খেটে মরছে সে। কিন্তু দাঁতস্থ হয়ে পবন ভাবতে শুরু করে তাদের গরুটি এখানে এল কি করে। ও সকালবেলায় তাকে সুস্থ দেখেছিল। গরুটার এমন অবস্থায় তাকে কেউ একবার খবরও দিল না? পড়শিরা নিশ্চয়ই ছোট বউকে বুঝিয়েছে, মরা গরু ঘরে থাকলে পোয়াতির অকল্যাণ হবে। হয়ত জোর করেই ওরা ভাগাড়ে দিয়ে গেছে।

পবন গরুটার দিকে তাকায়। গরুটা নির্বিকার শুয়ে আছে এখানে। এই ভাগাড়ে এলে; আর গেরস্থের উঠোনে ফেরার পথ থাকে না। গরুটার খোলাটে মরা চোখ দু'টোর কোণ বেয়ে জলের ধারা, এখনো চামড়া ভিজে আছে সেখানটায়।

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে পবন। কী করবে বুঝতে পারে না। বসে পড়ে মরা জন্তুটার গায়ে হাত বুলোয়। একবার ভাবে, ঘরে ফিরে যাবে।

তার মা বলেছিল, চাঁদ হবে বাছুরের মাথায় টুঁটিটা কি সব জানে! পবন কি পেটটা কেটে দেখবে, বাছুরের মাথায় চাঁদ হয়েছে কি না? পেটের ওপর হাত রাখে। সামান্য একটু গভীরে, আরও একটা প্রাণী। শুয়ে আছে। কোনদিন উঠবে না আর। বাইরে বেরুবে না। ছোটাছুটি করবে না।

বৌটার কথা মনে পড়ে পবনের। তার শরীরের গভীরেও অঙ্কুরিত হচ্ছে পবনের বীজ। বেশী দেরী নেই। পবনের দুঃখ, উপযুক্ত পরিচর্যা করতে পারছে না সে অঙ্কুরটার। ঘরে তার একটা কানাকড়িও নাই।

অভাব বড় নিষ্ঠুর। একটা চামড়া পেলে, পাইকার তাকে ভালো টাকাই দেবে। শরীরের গভীর অন্ধকারে পবন অঙ্কুরটাকে দেখতে পায় না। প্রথম পোয়াতি বৌটার শীর্ণ মুখ ভেসে ওঠে পবনের চোখে। কোমর থেকে চাকু বের করেও স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে পবন। তার হাত পা সরতে চায় না। একটা মরা গরুর চামড়া ছাড়ানো, কী এমন কাজ! অভ্যস্ত নিপুণ হাতে কতটুকু সময় লাগবে পবনের। কিন্তু তার কেবলই মনে হয়, আমার বুড়ী মায়ের যত্নে তেল চকচকে হয়েছে এই চামড়াটা। চাকু চালিয়ে টেনে ছিঁড়ে তুলে আনা কঠিন কাজ।

কিন্তু চামড়া তো পড়ে থাকবে না। রাত নামবে এবার। শেয়াল কুকুর কামড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। নষ্ট হয়ে যাবে সবটা

এটা থেকেই হয়ত আসতে পারে। কদিন ভালো খেতে পারে তার পোয়াতি বউ।

ক্রমশঃ রাত নেমে আসছে এবার। ভাবনার আর অবকাশ নেই বেশী।

গরীব মানুষের গরু ছাগলও যত্নে থাকে। তেল চকচকে থাকে তাদের শরীর। কিন্তু অভাবের তাড়নায়, ক্ষুধার চাবুক খেতে খেতে মানুষগুলোর নিজেদের ছালচামড়া, হৃদয়-মন ভোঁতা হয়ে যায়। খাঁচায় আটকানো জন্তুর মতো অনেক বাধ্যতা তখন তার জীবনে। সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। শকুনের পালটা মাটিতে নেমে পড়েছে। কাছাকাছিই বসে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। পবনের এই মোহাচ্ছন্নতা তাদের বোধের অতীত।

পবনের সম্বিত ফেরে। এগিয়ে গিয়ে গরুটার কুরে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে পবন কৈবর্তদাস। চাকু বের করে কাজে লেগে যায়। [illegible]

এখানে পিঞ্জর

পাপিয়া ভট্টাচার্য

যমের অফিস থেকে ফিরেছে। তাকে দেখতে দিয়ে পূর্ণা ছেলেকে একান্তে ডাকল চুপিচুপি, 'আর একবার দেখে আয় তো সৌম্য।' ছেলে খুবই বিরক্ত হয়, 'এই তো দেখে এলে মা, পাঁচ মিনিটও যে হয়নি এখনও।' 'এর মধ্যে কি আসতে পারে না' বলে ছেলের অপেক্ষা না করেই পশ্চিমের বারান্দায় যায় পূর্ণা। না, কেউ আসে নি। তার বুকটা আশঙ্কায় কাঁপতে থাকে। কে জানে কি হল মেয়েটার! সামনের কাঁকা ঝুপসি বাড়ীটাকে আরো ভয়ঙ্কর, আরো কুৎসিত দেখাচ্ছে।

চারিদিকের ছোট বড় সুদৃশ্য বাড়িগুলির মাঝের একফালি জায়গায় ঐ ঝুপসি ঘর দু'খানা এত বেমানান চোখে না পড়ে উপায় নেই। বিশেষ করে রায়েদের এই বিশাল তিনতলা বাড়ির ঠিক পিছনেই ঐ ছোট্ট ছেলে পড়া ঘর দু'খানি এমন অসহায় ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকে যেন প্রতি মুহূর্তেই তার বিপন্ন অস্তিত্ব টের পায় পূর্ণা। রায় কর্তা অনেকবার চেষ্টা করেছেন জায়গাটা কিনে নেবার। দিব্যি একখানা গ্যারেজ করা যায়, কিন্তু ও-বাড়ীর কাস্তু কিছুতেই রাজী হয় নি। রায় বাড়ির সঙ্গে ওদের শুধু একটাই মিল যে, রায়দের একমাত্র পুত্রবধূ পূর্ণা আর কাস্তুর বৌ ছবি একইদিনে শ্বশুর বাড়ি এসেছিল। আর যদিও কল্পনা করা যায় না, তবু আশ্চর্য, কেমন করে দু'জনের মধ্যে ভাবও জমে উঠেছিল। অবশ্য সখীত্বের পর্যায়ে তাকে ফেলা যায় না ঠিকই, বরং পূর্ণা যখন ছাদে বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে কখনও কৌতূহলী চোখে দেখত ছবির খোলা সংসার, তখন সেদিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকা ছবির ঈর্ষা মিশ্রিত বিস্ময়ের দৃষ্টি অনেকটাই ছিল অনুগৃহীতের মত। তবু কথাবার্তাও চলত।

রোজ বিকেলে গা ধুয়ে পূর্ণা যখন ছাদে যায়, ছবিরও সে সময় অবসর। সামনের উঠোন মতো জায়গাতে ছোট আয়নাটা রেখে তেল মেখে সে চুল বাঁধে। সেদীয় ভাগই সে একাই বন্ধক করে যায়।

একটির ছেলের ঐ আলাপচারিতার মাঝে ছবি জানায়, তার বড় মেয়ে সুমির বিয়ে ঠিক হচ্ছে। পাত্র পক্ষ পছন্দ করে গেছে, তাদের অবস্থা ভাল, জমি-জমা আছে। শুনে এমন চমকে যায় পূর্ণা যে, ছবিও অপ্রস্তুত হয় একটু। 'সুমির বিয়ে দিচ্ছ? সুমির?' প্রায় হাঁফিয়ে বলে পূর্ণা, 'ঐটুকু মেয়ের বিয়ে দেবে কি?' ছবি একটু মলিন হয়। —'কি করি দিদি, আমারই কি এখন দেবার ইচ্ছে, কিন্তু সুমির বাপ বলছে ভাল সম্বন্ধ, দাবি-দাওয়া কম, এরপর আরো একটি আছে, আমাদের তো এই অবস্থা; তাছাড়া এমন কিছু তো ছোট নয়, চোদ্দ ঘুরিয়ে পনেরোয় পড়বে এবার। আমারও তো ষোল বছরে বিয়ে হয়েছে।' —'সে জন্যেই তো' আবার ঝুঁকে পড়ে পূর্ণা, আগ্রহ মিয়ে বোঝায়, 'সে জন্যেই তো তুমি বুঝবে কষ্টটা! তোমার নিজের অবস্থাটা দেখছ! সুমির বুদ্ধি ভাল, মাধ্যমিকটা পাশ করুক অন্তত:।' 'সুমির বাবা যে বলছে এখনই দেবে' বলে ছবি। এবং পূর্ণা জানে কাঠ-গোঁয়ার বাসু কারো কথা শুনবে না। কিন্তু তার খারাপ লাগে ছবির চোখে-মুখে মেয়ে আর সম্মতি দেখে।

পরদিন সুমি স্কুলে যায়, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে লক্ষ করে দেখে পূর্ণা। চোদ্দ বছরের তুলনায় মেয়েটা বেশ লম্বা, কিন্তু তার শ্যামলা রোগা শরীরটা নেহাতই এক কিশোরীর। বধূ হবার জন্য ওর শরীর-মন কিছুই প্রস্তুত হয় নি এখনও। কিন্তু সুমি তার মেয়ে নয়, মাঝে মাঝে পড়াটা একটু দেখিয়ে দেওয়া ছাড়া সে আর কোন দায়িত্ব নিতে পারবে না। তাছাড়া পরের ব্যাপারে এই নাক গলানোর অভ্যেস পূর্ণাকে ইতিমধ্যেই শ্বশুরবাড়ির সবার কাছে অপ্রিয় করে তুলেছে। সে চেষ্টা করে ব্যাপারটা ভুলে গেছে, কিন্তু সুমির বিয়ে যখন সত্যিই ঠিক হয়ে যায়, তখন সে ব্যাকুল হয়ে রমেনকে ধরে, 'তুমি বাসুকে ডেকে একটু বুঝিয়ে বলো না।' রমেন যত অবাক, তত বিরক্ত হয়। —'সে আমার কথা শুনবে কেন? আর আমি এমন অন্যায় কথা বলবই বা কেন? তার মেয়ে, সে যা ভাল বুঝবে, করবে। তাছাড়া সত্যিই তো, গরীব মানুষ, পরপর তিনটে ছেলে মেয়ে। ভাল পেয়েছে, দিচ্ছে। ওদের মেয়ে, ওদের চেয়ে তোমার দরদ বেশী?'

সুমি তার কাছে মাঝে মাঝে ইংরেজী পড়ে নেয় এখন আর

আসে না। পূর্ণা তাকে ডেকে বলে— 'সুমি, তুই দুল কাপ্তাকাটি কর, বল আমি পড়ব, বিয়ে করব না।'—'আমি কত বলি, বাবা-মা আমাকে মারতে আসে' সুমি জানায়। নতুন কাপড়, দু'একটি গয়না, একটু উৎসব-এছাড়া বিয়েটা ঠিক কি, ক্লাস এইটের সুমি এখনও তা বোঝে না ভাল। কিন্তু সেটা যে তাকে তার এই জীবন, ভাইবোন, মা-বাবা, স্কুল, খেলাধুলা সব কিছু থেকে সরিয়ে দেবে— এই আতঙ্কে সে কাঁদে।

অতঃপর সুমির বিয়ে হয়ে যায়। ছবিদের বাড়ীর দিকে পূর্ণা রাগ করে তাকায় না, কিন্তু বিয়ের পরদিন ছবি যখন সারাদিন কেঁদে বেড়ায়, তখন ছাদে পূর্ণার বৈকালিক পদচারণা কেমন নিরানন্দ মনে হয়। যদিও সে রমেনের কথার যথার্থতা এখন অনুভব করে। পরের মেয়ের জন্য অকারণ এত মন খারাপ করাটা তার নিজের কাছেই অর্থহীন মনে হয়। তবু আট-নয়ের পরিপূর্ণ যুবক সুমির মরের লম্বা-চওড়া চেহারার পাশে রোগা-পাতলা বালিকা চেহারার সুমিকে দেখে সে গোপনে নিঃশ্বাস ফেলে।

মাস চারেক পরে পূর্ণা যখন সুমির কথা বলতে বসেছে তখন ছবি একদিন কাঁদো কাঁদো হয়ে তাকে বলল—'তুমি ঠিকই বলেছিলে দিদি, এখন বিয়ে না দিলেই হত। ঐটুকু মেয়ে বাড়ি আসার জন্য কত কাঁদে, তারা পাঠায় না বলে নিয়ের পর অত পাপের বাড়ি কি!' পূর্ণা বিড়বিড় করে বলল, 'তা বাবা মা হয়ে তোমরা যদি সুরক্ষা করতে পারো, তাহলে তাদের আর দোষ কি?' ছবি শুনতে পায় না। বলে—'তাই বলছি দিদি লেখাপড়াটাও হল না, আবার তারা বলে এতবড় দিদি মেয়ে, পনেরো বছর না হাই, সব কাজ করায়।' দোষের মধ্যে সুমি লম্বা। এই গরীবের সংসারেও ছবি প্রাণপণে চেষ্টা করত নিজেই সব কাজ করে নেবার। যদিও তার যুক্তি ছিল অন্য, 'এখন থেকে খেটে মরবে কেন? মেয়েছেলে, পরের বাড়ি গিয়ে তো করতেই হবে।' এখন বয়সে ছোট এবং লম্বায় বড় সুমি সমবয়সের মত অত কাজ করতে না পেরে এবং বৌ এর পক্ষে অনুচিত ছেলেমানুষী করে ফেলার জন্য পদে পদে লাঞ্ছনা ভোগ করে।

ষোলো বছরে পা দিতে না দিতেই সুমি সন্তানসম্ভবা হয়। মাস ছয়েক পরে বিস্তর কাকুতি মিনতি করে বাপু সুমিকে নিয়ে

এলো। রোগা রুগে যাওয়া, ক্যাকাশে চেহারায় সুমিকে দেখে ছবি অনবরত চোখ মোছে। জন্মের বছর দেড়েকের মধ্যে তার দ্বিতীয় বোনটি কৃমিষ্ট হওয়ার কারণে সুমি ছোট থেকেই দুর্বল। এখন ডাক্তার বলে, তার ভীষণ এ্যানিমিয়া। খুব রক্ত চাই। ছবি তার শেষ সম্বল কানের দুল দুটি বাঁধা দিতে এলে পূর্ণা ফিরিয়ে দেয়। তার হঠাৎ মনে হয় তারা সবাই তো দিনরাত কত বড় বড় কথা ভাবে আর বলে। ঘরের পাশের মানুষটির দুঃখে-কষ্টে তাদের সত্যিকার অনুভূতি কতটুকু? পূর্ণা নিজের থেকেই কিছু টাকা দেয় এবং এজন্য কিছুটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। ছবি, সুমির বিয়ের সূচনাতে পূর্ণার বিরোধিতা দেখে ভেবেছিল সংসারে ভালো কেউ দেখতে দেখতে পারে না। ছবি একরকম করে বোঝে যে একটি অপরিণত অপুষ্ট শরীরের কিশোরী কি করে একটি সুস্থ সন্তানের জন্ম দেবে। এসব ভেবে পূর্ণাও তার মতো কষ্ট পায়।

দুপুরে সুমিদের বাড়ির পাশের সরু গলিটা দিয়ে কলকল করে ছুটে যায় সুমির বন্ধুরা। চোখের তলায় গভীর কালি, রক্তহীন সাদা শীর্ণ চেহারার সুমি ভার ভারী হয়ে আসা শরীর নিয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে দেখে তাদের। তার ভালোলাগাহীন মুখ থেকে কৈশোর মুছে গেছে। নতুন যৌবনের উজ্জ্বলতাও নেই। আশাহীন, আনন্দহীন, স্বপ্নহীন সেই মুখে কষ্টের ছাপ লেগে বয়স্ক দেখায় তাকে। নৌ হয়ে সে পীড়ন ভোগ করেছে, মা হয়ে কি কি করতে হবে সেকথা তার জানা নেই। জোর করে চাপিয়ে দেওয়া এই বধূত্ব আর মাতৃত্ব, তার শৈশব অকালেই শেষ করে দিয়েছে। সে নিজেও জানে না, সেই কথাটাই তার নীরব মুখে ফুটে ওঠে কেমনভাবে।

বাস্তু ফিরছে। পূর্ণা উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকিয়ে থাকল। আজ সকালেই সুমিকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। কাল রাত থেকেই তার শরীরে একটা পিঁচুনির মত হচ্ছিল। ছোট ছেলেমেয়ে দুটিকে মাসীর বাড়িতে রেখে ছবিও হাসপাতালে। পূর্ণা বাস্তুকে জিগ্যেস্ করল—'সুমি কেমন আছে?' উদ্বেগে, দুশ্চিন্তায় বাস্তুর মুখ শুকনো। —'ডাক্তার বলছে একলাম্পিয়া না কি যেন। এখন একেবারে জ্ঞান নেই। ফেনা বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে। এরকম হলে নাকি একজন বাঁচে, মা না হয় বাচ্চাটা। আমরা বলছি আগে মেয়ে বাঁচুক, তা

সুমির শ্বশুরবাড়ির লোক শুনছে না তাই বলে সংসারের প্রথম সন্তান, তাকে আগে বাঁচাতে হবে। আবার সিজার করতেও দেবে না। সুমি আর বাঁচবে না বৌদি,' বলে হু হু করে কাঁদে বাপু— 'কি ভুল করেছি। ঐ মেয়ের যে এখন হেসে-খেলে বেড়ানোর সময়।'

সুমি একরকম প্রাণে বাঁচে। পেট কেটে মরা বাচ্চা বের হবার পর থেকে শ্বশুরবাড়ির লোক আর আসে না। তারা বলেছে, ঐ কদ্য, খুঁতো, পিঁচুটী রোগের মেয়েকে তারা নেবে না। আর সুমির বর তো চিরদিনই ভাল ছেলে, সে মা-বাবার বাধ্য। এখন নড়বড়ে ঘর তুলসির মতই বাপুরা সপরিবারে আরো জরাজীর্ণ হয়ে উঠতে থাকে।

'সৃজন' এর অগ্রগতিতে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই—

শ্রীঅনন্তকুমার মাইতি

সহ-প্রধান শিক্ষক

খুকুড়দহ আই. সি. এম এস. উচ্চ বিদ্যালয়

খুকুড়দহ ☐ মেদিনীপুর

অপসংস্কৃতি প্রতিরোধে নারীর ভূমিকা

দীপ্তি সরকার

একবিংশ শতাব্দী শেষের বহু আলোচিত একটি বিষয় হোল—অপসংস্কৃতি বা সংস্কৃতির অবক্ষয়। দেশের সংস্কৃতি অনুরাগী মানুষ বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত। প্রায় সকলেই উদ্বিগ্ন—কিভাবে সংস্কৃতি জগতকে সঙ্কট মুক্ত করা যায়। তাই দিকে দিকে ধ্বনিত হচ্ছে সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তোলার নারীর কোন বিশেষ ভূমিকা আছে কিনা।

প্রশ্নটির যথাযথ উত্তর দেবার আগে আমাদের জানতে হয় যে 'অপসংস্কৃতি' বলতে কি বুঝি। সংস্কৃতি মানুষকে পরিশীলিত করে, সুন্দর করে তোলে ও চেতনায় সমৃদ্ধ করে। আর সংস্কৃতির 'অপ' অর্থাৎ কুৎসিত, দূষিত, অর্থ দিক হোল অপসংস্কৃতি সুস্থ সংস্কৃতির বিপরীতে এই অপসংস্কৃতি মানুষের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে, ধ্বংস করে এবং মানুষের অগ্রগতি ব্যাহত করে, অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। সমাজে আজ সংস্কৃতির এই সঙ্কট কাল সংস্কৃতি হয়েছে অপসংস্কৃতি। কিন্তু এমন তো ছিল না আজ প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশের একটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে যা অনুকরণ যোগ্য। ভারতের সংস্কৃতি, বাংলার সংস্কৃতি আমাদের গর্বের বস্তু। বস্তুর চেয়ে মূল্যবোধ ও ভাবকেই তুলে ধরেছেন আমাদের দেশের ঋষি-কবি, কবি, শিল্পী এবং সাহিত্যিকগণ। কিন্তু সাম্প্রতিককালে সংস্কৃতির নামে অধিকাংশ সাহিত্য-শিল্পে, নাটকে, সঙ্গীতে, নৃত্যে যা প্রকাশ পাচ্ছে এবং দেখানো—শোনানো হচ্ছে তার সঙ্গে চিরন্তন মূল্যবোধের কোন যোগ নেই। সংস্কৃতির মধ্যে আজ বিশেষ আধিপত্য-ঘটেছে যৌনতা এবং অশ্লীলতার। মানুষ আজ মানুষকে বিশ্বাস করতে, শ্রদ্ধা জানাতে, ভালবাসতে ভুলে যাচ্ছে। তার বদলে ঈর্ষান্বিত আচরণ, ঘৃণা, হিংসা, হিংস্রতা, স্বার্থপরতা সমাজে প্রকট হয়ে উঠছে। দেশতে দেশতে বিগত কয়েকটা বছরে গ্রাম এবং শহরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে অশ্লীল

দেওয়াল পোষ্টার থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপনের সিনেমা, নাটক, ফ্যাশন, যৌনবিকৃতিসূচক নাচগান, রুচিহীন পোশাক-আশাক ইত্যাদি। এইভাবে অপসংস্কৃতির মানসদূষণ, পরিবেশ দূষণের থেকেও আমাদের ক্ষতি করছে।

একালের 'সংস্কৃতি প্রভু'-দের প্রধান হাতিয়ার অশ্লীলতা। নারীকে নিয়ে যৌন বিকৃতির একটা নরক সৃষ্টি করা তাদের অন্যতম বিষয়। রঙবেরঙে মোটা দাগের টি. ভি প্রোগ্রামে, রঙ্গমঞ্চে, ছায়াছবিতে নারী-পুরুষের কেন্দ্রাক্ত অশ্লীল নৃত্যে, নারীদেহের কদর্য বিজ্ঞাপনে আমাদের ছেয়ে গেছে। বোঝানো হচ্ছে, খেপানো হচ্ছে—নারী পুরুষের দাসী, ভোগ লালসার সামগ্রী, ব্যবসায়ের পণ্য। এসব ঘটছে মার্কিনী সভ্যতার অনুকরণে বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠির স্বার্থে। এইভাবে বিকৃত সংস্কৃতিতে যুব-সমাজকে, নতুন প্রজন্মকে সংগ্রাম বিমুখ করে, পঙ্গু করে তোলা হচ্ছে।

যখন কামিনী-কাঞ্চনই সমস্ত অনর্থের মূল বলে দাবী করা হচ্ছে, এমন পরিস্থিতিতে আজকের নারীকে আর নিষ্ক্রিয় থাকলে চলবে না। কয়েক দশক ধরেই—নারী স্বাধীনতা, নারী মুক্তি, নারীর অধিকার, ফেমিনিজম-এর মত বিষয়গুলি নিয়ে নারী সমাজ খুব বেশী চিন্তা-ভাবনা করছিল। কিন্তু আজ আমাদের লিখতে সংকোচ হয়। আজকে নারীকেই এগিয়ে আসতে হবে দেশের সংস্কৃতি-বিকৃতির রুখতে। অবশ্য নারী রান্নাঘরের ছাতা-পুন্থি ফেলে বেরে বাইরের জগতে এসে পড়েছে। বিজ্ঞান মনস্ক ও শিক্ষিত হয়েছে এবং তারা নানা জাতীয় সঙ্কটের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। কিন্তু সমাজের নানাক্ষেত্রে নারীর বর্তমান অবস্থানটি ভাববার মত।

ভোগ্যপণ্যের বিজ্ঞাপনে নারী আজ পণ্যের সমতুল। টেলি-ভিশনের প্রায় সমস্ত জিনিসের বিজ্ঞাপনে নারীকে হাজির করা হয়। সামান্য এক সাবানের বিজ্ঞাপনে দেখানো হয় স্নানাগারে স্নানরত প্রায় উন্মুক্ত নারীর শরীর। সাবান কি শুধু নারী জাতিই ব্যবহার করে? আর ঠাণ্ডা পানীয়ের বিজ্ঞাপনে তো থাকে স্বল্পবাস পরিহিত উচ্ছল তরুণ-তরুণীর জলক্রীড়া। এমনকি যে জিনিষের সঙ্গে নারীর কোন যোগই নেই সেই শেভিংক্রীম বা গেঞ্জীর বিজ্ঞাপনেও নারী উপস্থিত। আসলে ভোগাদ্রব্যের নিজস্ব নিম্ন গুণমান আড়াল করতে নারীকেই অশ্লীল ভঙ্গীতে দর্শকের সামনে

মুখ্য বিষয়রূপে, পণ্যরূপে ব্যবহার হয়। এবং দর্শকদের বিভ্রম ঘটিয়ে নিষ্ক্রিয় করে রাখার চক্রান্ত করা হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় দর্শকদের মধ্যে থেকে নারীকেও ঐসব কদর্যতার সাক্ষী থাকতে হচ্ছে।

নারীকে যে কতভাবে হেয় করা হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। ভারতের ৪৯তম স্বাধীনতা দিবসের উপহার হিসাবে আমরা, সুস্থ সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষ অবাক হয়ে দেখি, ভারতীয় লোক রপ্তানি উন্নয়ন পরিষদ কেন্দ্রের লাইসেন্স পেয়ে সিঙ্গাপুরে ৫০০ (পাঁচ সতর) যুবতী পাচার করছে। এই নারী পাচারের একটাই উদ্দেশ্য তাদেরকে দেহব্যবসায়ে নিযুক্ত করা। এছাড়া নারীকে নির্মমভাবে দৈহিক নির্যাতনও করা হচ্ছে। সম্প্রতি এক যুবতীকে ছেলেধরা সন্দেহে উলঙ্গ করে ইট দিয়ে থেঁতলে হত্যা করা হয়। ১৯৯৪ সালের এক সরকারী হিসাবে দেখানো হয়েছে সারা দেশে ১১ হাজার মহিলা ধর্ষিতা, ২২ হাজার শ্লীলতাহানির শিকার, কন্যা-ভ্রূণ হত্যাও ক্রমবর্ধমান এবং বধূ হত্যার ঘটনা ঘটেছে প্রায় পাঁচ হাজার। এসব ঘটনা সামগ্রিকভাবে সামাজিক ও সংস্কৃতি জগতের অবক্ষয়কেই বিস্তৃতি দিয়েছে।

সাংস্কৃতিক জগতের অবক্ষয়ের কথা বোধহয় অসমাপ্ত থেকে যাবে যদি এর আর একটি কলঙ্কের কথা উল্লেখ না করা হয়। সেটা হচ্ছে 'ইভ্‌টিজিং'। কিছু স্বল্পশিক্ষিত নিম্নমানের বেকার রগচটা যুবক, এমনকি কিছু ধনী ভদ্রঘরের তরুণদের মধ্যেও কিশোরী, তরুণীদের উদ্দেশ্যে এই ইভ্‌টিজিং (Eveteating) ব্যাপক প্রচণ্ডভাবে দেখা যাচ্ছে। এরা দলবেঁধে কিশোরী-তরুণীদের উত্যক্ত করে। এই উত্যক্তীকরণ এমন পর্যায়েও পৌঁছয় যখন দেখা যায় হঠাৎ কোন মাস্তান সাইকেল বা মোটর সাইকেলে চড়ে কোন তরুণীর পাশে গিয়ে হাত ধরে টানে বা গায়ের ওড়না (দোপাট্টা) সহজেই তুলে নিয়ে উধাও হয়ে যায়। এর ফলস্বরূপ মেয়েরা হলছুট হয়ে ঘোরাফেরা বা যাতায়াত করতে ভয় পায়। এ ঘটনার প্রতিরোধ হিসাবে মাঝে সংবাদপত্রে দেখা গেল, আধুনিক মেয়েরা দল বেঁধে বিচ্ছিন্ন ও মেধাবী যুবক, তরুণদের ইভটিজিং করতে শুরু করেছে। কিন্তু ঐ অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে এটা প্রকৃত প্রতিরোধ নয়।

এরজন্য দরকার মেয়েদের কথাবার্তা, পোষাক পরিচ্ছদে শালীনতা আনা। আত্মরক্ষার জন্য জুডো, ক্যারাটে শেখা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে

মানসিক দৃঢ়তার সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ানো বা প্রতিবাদ করা। এই প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বেশ কয়েক মাস পূর্বের এক ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। সে ঘটনায় দেখা যায়, একদিন সান্ধ্যরাতে দক্ষিণ কলকাতার মেট্রোরেল স্টেশনের গেটে অপেক্ষমান কিছু মানুষের মধ্য থেকে স্বামীর উপস্থিতিতে তার সুন্দরী স্ত্রীকে কিছু মাস্তান মোটর-ভ্যানে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করে। তখন একজনও বাধা দেয় না নিজেদের আত্মরক্ষা বা গা বাঁচানোর তাগিদে। কিন্তু দেখা যায় হঠাৎ তন্বী এক তরুণী সেই কিডন্যাপিং মহিলাকে রক্ষা করার জন্য হাত ধরে টানে ও গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসে। তখন জনতার সম্বিত ফেরে, সেই সঙ্গে গুণ্ডারা বেগতিক দেখে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। তো, বলতে চাই এমনি করেই শারীরিক ভাবে দুর্বল হলেও নারী জাতিকে ঐ তরুণীর মতই মানসিক শক্তিতে দুর্বার হতে হবে এবং নিজেদের সম্মান রক্ষা করতে হবে। নারী জাতিকে আত্মসম্মান রক্ষার জন্য নিজেদেরই সচেতন হতে হবে।

নারীকে আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে এই বলে সোচ্চার হতে হবে—আমি আর কদর্য বিজ্ঞাপনের 'মডেল' হতে চাই না। যৌনকর্মী, দেহ ব্যবসায়ীরূপে চিহ্নিত হব না। আমাদের দেহ-সৌন্দর্যকে ব্যবসায়ী লিপ্সার প্রচারের মাধ্যম হতে দেব না। আমরা মানুষ, মানুষ হিসাবে আমাদের পূর্ণ মর্যাদা চাই বাস্তবিকই যে সংস্কৃতিতে নারী জাতিকে উপযুক্ত সম্মান না দিয়ে হেয় করা হয়, অপমানজনক কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য করা হয়, সে সংস্কৃতি কখনই সুস্থ নয়। সেই সংস্কৃতি যে নারী সমাজের পক্ষে কত বড় অপমান, কত বড় লজ্জা, কতখানি অবমাননাকর তা দূর করতে সমগ্র নারী সমাজের আত্মসচেতনতাই আগে প্রয়োজন।

গ্রামে শহরে সব জায়গায় নারী আজ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছে। সেইভাবে তাকে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চাতেও অংশ নিতে হবে। সভা—সমিতিতে বক্তৃতা, প্রচার, মিছিল এবং দৈনন্দিন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন কু-প্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে হবে। যেমন পণপ্রথা, নির্মমভাবে ছেলেধরা ও ডাইনি নামে নির্বিশেষে মানুষ হত্যা, কন্যাভ্রূণ নষ্ট ইত্যাদি অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে আজকের নারীকে প্রতিবাদে মুখর হতে হবে।

নারীর নিজের আচার-আচরণ, পোশাক-আশাক, কথাবার্তা যাতে সুরুচি, শোভনতা, শালীনতার পরিচায়ক হয়ে ওঠে সেদিকে সতর্ক হতে হবে। এটা পরোক্ষভাবে হলেও অপসংস্কৃতি রোধের একটি উপায়। যেমন, সম্প্রতি মহানগরের এক বিখ্যাত মহা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীর পোশাকের শালীনতা নিয়ে স্বয়ং অধ্যক্ষ মহাশয়কে প্রতিবাদ করতে হয়েছিল। আমাদের ঘরের মেয়েরা, বধূরা বাইরে এসেছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিংবা কর্ম প্রতিষ্ঠানে। সেখানে তাদের স্বতঃ-প্রণোদিত হয়ে পোশাকে, চলনে-বলনে মার্জিত, প্রশংসনীয় ও অনুকরণযোগ্য হয়ে উঠতে হবে।

অপসংস্কৃতি রোধে জায়া, জননীরূপেও নারীর একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। এইতো সেদিন ছোট্ট শিশু 'অয়ন'-কে ঘিরে কোর্ট-কাছারিতে যে চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে গেল, তা যে কোন দেশ, কালে ধিক্কৃত। কোন দম্পতির মধ্যে যথেষ্ট না বনিবনা বা বিরোধের কারণ থাকতে পারে, কিন্তু তার জন্য সন্তানের জীবনে অন্ধকার নেমে আসবে কেন? নারীকেই এখানে মানবিকতার নামে, আত্মজের জন্য নাড়ী-ছেঁড়া সন্তানের জন্য 'ঈগো', একগুঁয়েমি, আত্মসুখ ত্যাগ করতে হবে। এটা কোন পরাজয় বা আত্ম অবমাননার ব্যাপার নয়। বরং এটা মহত্বের ও উপযুক্ত মানুষের মত কাজ।

সমাজে নারীদের মাতৃজাতিরূপে একটা দায়বদ্ধতা আছে। সে দায়বদ্ধতা জননীরূপে। সন্তানের শৈশব, কৈশর কাটে জননীর স্নেহ-ছায়ায়। অর্থাৎ ছেলে মেয়েদের উপর পিতার থেকে মায়েদেরই প্রভাব বেশী। সেই প্রভাব যেন ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। তাদের সুস্থ জীবনবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে, মানবিক মূল্যবোধ শেখাতে হবে। মাতৃভাষাই যেন হয় আমাদের সন্তানের প্রথম ভাগ। তাদের পোশাকে, আচ্ছে, রুচিতে আচরণে যেন থাকে শালীনতা, স্বাস্থ্যবিধি, মার্জিতার ও নম্রতার ছাপ। বর্তমানে তথাকথিত আধুনিকাদের মধ্যে আমরা দেখি অন্য একরকম প্রবণতা। তারা ছোট থেকেই সন্তানের ভবিষ্যৎ ছক্ কষে ফেলেন। মুখে আধো আধো বোল ফুটতে না ফুটতেই ইংলিশ মিডিয়াম নার্সারীতে দিয়ে দেন। সেখানে শিক্ষার নামে পাশ্চাত্য অনুকরণে মামি, ড্যাডি থেকে শুরু করে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, অঙ্গভঙ্গী নৃত্য-গীত সবকিছুতে সাহেবীয়ানা আনতে প্রয়াস চালানো হয়। আর

বাড়িতে তো শিশুবাহক মগজ ধোলাই শুরু হয়ে যায়। তাকে স্বপ্ন দেখানো হয় বড় হতে হবে, বিদেশ যেতে হবে, দেশের মাটিতে কিছু হবে না। তাই বোধহয় বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে দেখা যায় প্রচণ্ডরকমের বিদেশমুখীনতা। এ সবই অপসংস্কৃতি। এর বিরুদ্ধে নারীকে এগিয়ে আসতে হবে। শৈশব থেকেই শিশুর মানসিক বৃত্তিগুলি—স্নেহ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, মমতা, সহমর্মিতা জাগিয়ে তুলতে হবে। স্বদেশকে চেনাতে হবে, সত্য, শিব, সুন্দরের আদর্শে তার চরিত্র গঠন করতে হবে। এই পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশুর উপর অপসংস্কৃতির কালো ছায়া পড়তে পারবে না। জীবনের প্রকৃত অর্থ না বুঝেই তো তরুণ-তরুণীর দল আশাভঙ্গের হতাশায় ভোগে, একটু সহানুভূতির অভাবে মাদকাসক্ত হয় সেই সঙ্গে তাদের হাতে হাতে ঘোরে অশ্লীল চিত্র, পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, হেরোইন।

এসব তো গেল অপসংস্কৃতি রোধের প্রাথমিক ব্যাপার। অপসংস্কৃতির মূল উৎস কোথায় তাও খুঁজে বার করা দরকার। এর মূল উৎস হচ্ছে বর্তমান সমাজের শ্রেণী শোষণ। শোষণভিত্তিক সমাজে মানস গঠন এবং সংস্কৃতি সব সময়ই শাসক শ্রেণীর মনোভাব ও স্বার্থ প্রতিফলিত করে। শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর একটা অংশ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে। সেজন্য শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিপালিত, সম্মানিত এবং পুরস্কৃত হয়। এই বিশেষ বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে লেনিন বলেছেন: "জনগণের 'বুদ্ধিজীবী শক্তিগুলি'র সঙ্গে 'বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী'দের গুলিয়ে ফেলা ভুল হবে।" এই শোষক শ্রেণীর তাঁবেদার শিল্পী-সাহিত্যিকরা সংস্কৃতির নামে শোষিত জনগণকে হেয় করে তুলে ধরে, এবং হেয় করে নারী সমাজকেও। বিশেষ করে নারীর এই চরম অপমান ও অবমাননার মধ্য দিয়ে অপ-সংস্কৃতির রমরমা অবস্থা। শ্রেণীভিত্তিক সমাজে নারীকে পুরুষের তুলনায় হীন বলে ধরে নেওয়া হয়। সমাজে নারী-পুরুষের এই তারতম্য মনুসৃষ্ট, সমাজের মূল অর্থনৈতিক কাঠামো থেকে উদ্ভূত। তাই অপসংস্কৃতিতে নারীকে যে অশ্লীল, হীনরূপে তুলে ধরা হয় তার পরিসমাপ্তি ঘটাতে নারীকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। সমগ্র নারী জাতিকে সামাজিক উৎপাদনের কাজের মধ্যে

প্রবেশ করতে হবে। তবেই নারী পায়ের তলায় মাটি পাবে এবং তাকে ঘিরে যে অপসংস্কৃতি প্রচলিত তার বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারবে। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজেই সম্ভব হয়েছে নারী পুরুষের সমান অধিকার, সমান মর্যাদা। আমাদের দেশেও শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে পুরুষের সঙ্গে নারীকেও রুখে দাঁড়াতে হবে, তবেই নারীকে কেন্দ্র করে অপসংস্কৃতির ভিত্তি ধ্বংস হবে।

আশার কথা, নবজাগরণের আলোকে নারী সমাজও জেগে উঠেছে নতুন চেতনায়। নারী প্রগতির ধারা ফুটে উঠছে শিল্পে, সাহিত্যে বিস্ফোরণে, বিদ্রোহে, জনমত গঠনে। তবে সুস্থ, সুরুচি সম্পন্ন মানুষ অপেক্ষা করছে সংস্কৃতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে আরও জোরালো প্রতিরোধের দিকে। তাই অপসংস্কৃতি ও তার ধারক এবং স্রষ্টাদের বিরুদ্ধে দেশের মানুষের অর্ধাংশ হিসাবে, শোষিত জনগণের অংশ হিসাবে, মা, বোন হিসাবে নারী সমাজকে অন্তঃপুরে এবং অন্তঃপুরের বাইরে এসে মাথা তুলে স্পষ্টভাবে বলতে হবে— আমাদের দেহ মনের সৌন্দর্য নিয়ে, আমাদের শ্রম নিয়ে অশ্লীলতা ও কুৎসা রচনা করবার অধিকার তোমাদের নেই

পড়ুন ও পড়ান

একটি সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক সাম্মাসিক

ঠিক এখনই

সম্পাদক ঃ স্বপনকুমার মাজী

—পরিচালনায়—

মাদপুর সাহিত্য পরিষদ ও পাঠচক্র

মাদপুর ঃ মেদিনীপুর

৭২১১৪৯

মানব সংস্কৃতি ও জীবজন্তু

শ্রীবসন্তকুমার রায়

পণ্ডিতপ্রবর সুকুমার সেন বলেছেন, "যে সব গুণ মানুষকে ইতর প্রাণী হইতে একেবারে স্বতন্ত্র করিয়াছে ভাষা বা বাক্‌শক্তি সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান।"[১]

তাঁর এই মন্তব্যের যথেষ্ট মূল্য আছে। তবু এই প্রসঙ্গে একটু অন্য কিছুও ভাবা যায়। সে ভাবনা হল, অতি উন্নত প্রাণী হিসাবে মানুষ কিন্তু তার একেবারে স্বতন্ত্রকারী-ভাষার আবিষ্কারে এবং প্রচলনে ইতর প্রাণীদেরই বহুলাংশে সাহায্য নিয়েছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষ তার ভাষার সঙ্গে সমগ্র সংস্কৃতির উদ্ভবে এবং উন্নয়নে ইতর জীবজন্তুর কাছে সবিশেষ ঋণী।

ব্যাপারটির একটু খোলা ব্যাখ্যায় আসা যাক

"মানুষ পশুর বৈমাত্রেয় ভাই"—বলেছেন জনৈক মহামতি। তা ছাড়াও সাধারণ একটি বিশ্বাস চালু আছে যে, মানুষ বন-মানুষেরই আত্মীয়। তাই, উভয়ের মধ্যে পুরাপুরি স্বাতন্ত্র্য থাকতে পারে না।

অবশ্য Gibbon-রা যে মানুষের পূর্বপুরুষ সে বিষয়ে তীব্র বিতর্ক আছে। আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না। আমি তাই Armsterdam University-র নৃতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক Dr. Dubois'র মতকে সমর্থন করি।[২] ডঃ দুবোয়া জাভাদ্বীপের সোলোভের পাহাড়ের নীচে বেঙোয়ান নদীর বালুগর্ভে কতকগুলি মুখের দাঁতের ও অন্যান্য অস্থির জীবাশ্ম খুঁজে পান। যেগুলি শুধু গবেষণার পর Pithecanthropus Erectus এর বলে তিনি সিদ্ধান্ত করেন। সেই প্রাণীরা হাজার হাজার বছর পূর্বে গাছ থেকে নীচে নেমেছিল, পেছনের দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিল, সেইভাবে তারা মাটিতে হেঁটে ছিল. বাধ্য-মাত্র খাওয়া ছেড়ে তারা প্রচলিত খাদ্য মৃগয়া ভেঙে ছিল, দুঃসাহসিক-ভাবে তাদের খাবার তারা যোগাড় করেছিল, Sabre-Toothed Tiger-দের খাদ্য মাত্র হয়ে থাকার বদলে এমন অতিকায় সব জন্তুর সঙ্গে লড়াইয়ে তারা নেমেছিল—যেখানে ভীষণ বিপদ ছিল, প্রাণভয় ছিল, রোমাঞ্চ ছিল এবং জয়ও ছিল। তাই সব মানুষ নয়, এই Pithecanthropus

Erectus-রাই মানুষের পূর্ব পুরুষ ছিল বলে ডঃ ডুবোয়া সিদ্ধান্ত করেন (Elio + Segal)। আর তাঁর এই সিদ্ধান্তটি বহু বিতর্ক ও প্রমাণের মাধ্যমে বিশ্বের সকল প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন। অবশ্য, এসব কথা জীব-বিজ্ঞানের বিবর্তনবাদের ও নৃতত্ত্বের মরচে-পড়া প্রথম অধ্যায়ে লেখা আছে: তা থাক।

আমরা বরং সেই প্রাচীনতম আত্মীয়দের কিছু আচরণ ও পরিচয়ে আসি:

সেই বন্য জীবনের কাছাকাছি থেকে সভ্য জীবনের কাছাকাছি আসতে সেই আদিম প্রাণীদের হাজার হাজার বছর লেগেছিল। এবং এই দীর্ঘ সময়ে নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করতে তারা বিশ্রী চেঁচামেচি ও চীৎকার করেছে। সেই কালে তারা তাদের কণ্ঠ ও জিহ্বাকেই প্রধানতঃ কাজে লাগিয়েছিল। ক্রমে তারা তাদের চীৎকার ও চেঁচামেচির মাধ্যমে এক একটি অর্থ প্রকাশ করেছে। সে ভাব ও অর্থগুলি ছিল হয়তো আশঙ্কা ও সতর্কতা জ্ঞাপক এবং আনন্দের। —আজকের আধুনিক মানুষও প্রায় তেমনিভাবে এই সব ভাবগুলি প্রকাশ করে থাকে।

পরবর্তী যুগে, তাদের হাত জিহ্বার স্থান অনেকাংশে দখল করে। কিছু চাইতে তারা হাত পেতেছে, আক্রমণ করতে হাত তুলেছে, কিছু কাটবার জন্যে তারা তাদের হাতের একটি ভঙ্গী করেছে এবং চলে যেতে, বা কাছে আসতে, বলার জন্যে জিহ্বার বদলে হাতেরই পাতাকে বাইরের বা কোলের দিকে ঠেলেছে।

অতঃপর তারা ব্যবহার করেছে তাদের চোখ—যার মাধ্যমে ভয়, ক্রোধ, বিষাদ, কান্না, কাম ও প্রেম তারা জ্ঞাপন করেছে। কিছু নির্দিষ্ট করতে ও চিহ্নিত করতে তারা ব্যবহার করেছে তাদের আঙুল, "হ্যাঁ"-"না" এবং উপলব্ধির ভাব প্রকাশ করতে তাদের মাথা, কিছু গ্রহণ বা বর্জন করতে তাদের মুখ, পছন্দ বা অপছন্দ বোঝাতে তাদের নাক, অস্তিত্বের ভাব সংগ্রহে তাদের কান, শব্দ গ্রহণ, প্রীতি প্রকাশ ও চুম্বনে তাদের ঠোঁট, ক্রোধ ও ধিক্কার জানাতে তাদের পদযুগলকে তারা সহজে ও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে। এইভাবে, সারা দেহই তাদের কথা কওয়ার কাজ করেছে। সেই দেহভাষাকেই মার্জিত, বর্ধিত ও সংস্কৃত করে এবং তার সঙ্গে

কালের ক্রম সংসর্গে এর Semantic যুক্ত করে মানুষ উন্নত ভাষাশৈলী সৃষ্টি করেছে। তথা ভাষাই মানুষের ভাষার পূর্ণতার পথে অগ্রযাত্রা এনেছে। তখন পদ, ব্যাকরণ ও অলঙ্কার ছিল নিতান্তই অজ্ঞাত ও অকারণ। "গাছের উঁচু ডাল বা ঘরের চালই ছিল তাদের কাছে observatory, আকাশ ছিল তাদের কাছে পত্রিকাস্বরূপ, বৃক্ষরা ছিল জীবন্ত গ্রন্থ, বল্কল ছিল স্থানত্যাগী সংবাদপত্র স্বরূপ, আর গুহাগাত্র ছিল তাদের কাছে একপ্রকার লিপি সহায়ক।"[৩]

ভঙ্গী বা দেহ যে কেবল সেই আরণ্যক জীবনেই প্রাঞ্জলভাবে ভাব প্রকাশ করেছে—তা নয়। আধুনিক কালেও মূকাভিনয়, Miming ও T V র Hearing Impaired এর মত অনুষ্ঠানগুলি দেহভঙ্গী মাধ্যমে অনেকটা সফলভাবে ভাব প্রকাশ, তথা ভাষার কাজ করে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, ইতর প্রাণীরা মানুষের ভাষা সৃষ্টিতে বিপুল প্রেরণা যুগিয়েছে।

শুধু ভাষাই নয়। ভাষার সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতি-সমগ্রের সকল উন্নত শাখায়, যথা—নৃত্য, সঙ্গীত, বাদ্য, নাটকাদি ও কতকগুলি গুরুতর ধারণা (Sophisticated Ideas, Totems) প্রভৃতিতেও ইতর প্রাণীদের অবদান দেখা যায়।

নৃত্যে দেখি, ভঙ্গীর মাধ্যমে সূক্ষ্ম ভাবগুলি সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়। নৃত্য অঙ্গাভিনয় ছাড়া আর কিছুই নয়। আর, এই অঙ্গাভিনয় মাধ্যমেই সভ্য মানুষ আজকে ইতর প্রাণীদেরই অনুকরণে আহ্বান, আক্রমণ, প্রতিবেদন, আবেদন ও সমর্পণ প্রভৃতি ভাবগুলি অত্যন্ত রসসম্পৃক্তভাবে প্রকাশ করে। তাছাড়া, হিন্দু নটরাজ মূর্তির বিপুল ব্যাখ্যাতেও এর কিছু সমর্থন পাওয়া যায়।

হিন্দু সমাজের গুরুতর কতকগুলি বিশ্বাস, যথা—রাশি (কর্কট, বৃশ্চিক, মৎস্য, কূর্ম, সিংহ ও বৃষ ইত্যাদি), গোত্র (কাশ্যপ ইত্যাদি) ও গণ (রাক্ষস ইত্যাদি) নামকরণ সেই ইতর জীবজন্তুর ভাবানুভবেই সৃষ্টি।

"ন ঋিত্যা সঙ্গীতেন ভব।" এই শাস্ত্রীয় ঘোষণা দ্বারা মানুষ সঙ্গীতের ব্যবহার ও দক্ষতার দাবী প্রসূত গর্ব বুকে নিয়ে জীবকুলে সর্বস্তরে মহীয়ান। কিন্তু সঙ্গীতের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাধারণ বুদ্ধিতেই সঙ্গীতের উদ্ভবের কথা অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। আর, সঙ্গীতের উদ্ভবে বা সৃষ্টিতে ইতর প্রাণীদের অভ্রান্ত ভূমিকা আছে। শাস্ত্রে উপরোক্ত মন্তব্যটির সমর্থন পাওয়া যায়। 'নারদীয় প্রতিশাখো'

পশুপাখীর বুলির মধ্যে স্বরবিন্যাস আছে ব'লে বলা হয়েছে। যথা—

ষড়জং বদতি ময়ূরো গাবো রম্ভতি চর্বভম্
অজাবিকেতু গান্ধারং ক্রৌঞ্চ বদতি মধ্যমম
পুষ্পসাধারণে কালে কোকিলো বক্তি পঞ্চমম
অশ্বস্তু ধৈবতং বক্তি নিষাদো বক্তি কুঞ্জর।

অর্থাৎ "মানুষের গানের সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি আদি যে সুরসপ্তক তা প্রকৃতির প্রজা যথা ময়ূর, গরু, ছাগল, ক্রৌঞ্চ, কোকিল, অশ্ব ও কুঞ্জরাদি পশু পাখীর কাছ থেকে নেওয়া।—তাছাড়া মানুষের মনে সুরের ছোঁয়া লাগে পাখীর গান থেকে। এমনকি, মানুষের চেয়ে পশুপাখীর অন্তিম আওয়াজে স্বরের বিকাশ অধিকতর প্রকট, সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত। মানুষের গান তার জন্মগতও নয়। কারণ, কোনও শিশু গান শোনার আগে গান গাইতে পারে না; কিন্তু, কাকের বাসায় লালিত হয়েও কাকের ডাকের অনুকরণ না ক'রেও কোকিল তার নিজস্ব গান গেয়ে ওঠে। তার গান অপরের কাছে শেখার প্রয়োজন হয় না!"৩

এই প্রাসঙ্গিকতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও বহু উক্তি আছে।

এই সঙ্গে আরও এক প্রশ্ন বক্তব্য এই যে, পাখী মানুষের কাছে গানের ব্যাপারে ঋণী নয়, বরং মানুষই পাখীর কাছে ঋণী; কারণ, প্রাণীতত্ত্বে পাখীরা মানুষের বহু পূর্বে, বা, মানুষ পাখীর বহু পরে, পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিল।৫

—Jazz নামে যে পশ্চিমী সঙ্গীত ব্যবহার করা হয় তা অন্তত্তক মনোরঞ্জনে-পূর্ণ আফ্রিকায় পুরাকালে পশুদের তৈরী চেঁচামেচির খুবই কাছাকাছি বা তারই পরিবর্তিত রূপ ছাড়া কি?

নৃত্য চিরকালই ইতর প্রাণী হলেও তা ভারতীয় সংস্কৃতিতে চিরকালই উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত।

Pitsman এর Short Hand এবং/বা Phonation কি কোনও প্রাণীর কাছ থেকে পাওয়া শব্দের এক অতি-কুশলী রূপ?—এটাও গবেষণার বিষয়।

মানুষের বাদ্য সংস্কৃতির উদ্ভবে এবং বিকাশের ক্ষেত্রেও আছে ইতর প্রাণীদের অকুণ্ঠ অবদান। বিপদাশঙ্কায়, যুদ্ধে, শত্রুদলনে ও উৎসবে ঋগ্বেদের যুগ থেকেই এই বাদ্য-সঙ্গীত মানুষ ব্যবহার ক'রে আসছে। "তখন মাটীতে গর্ত খুঁড়ে সেই গর্ত মুখে পশুর চামড়া দিয়ে বদ্ধ

ক'রে বাজানো হত যে বাদ্যযন্ত্র তার নাম 'ভূমি দুন্দুভি' পশুদের চামড়া ও নাড়ী দিয়ে তৈরী হ'ত 'পিঙ্গ'; ধনুকের সাহায্যে তৈরী হ'ত আরও এক বাদ্যযন্ত্র; পরে নামের ও সংস্কারের দিক থেকে তাই বাহ্লীন বা Violin নামে পরিচিত। বাদ্যযন্ত্রগুলির উদ্ভবে ইতর পশুর অবদান ছাড়াও বেণু, বীণা ও মৃদঙ্গের নাম যে-সব ঋগ্বেদীয় কাণে কর্কশ ঠেকেছে সেগুলিকে তাঁরা শৃগাল, পেচক ও উষ্ট্রকের রবনের ন্যায় বলে নিন্দা করেছেন—অর্থাৎ বাদ্যযন্ত্রের নিন্দাতেও পশুপাখীদের ধরে টানাটানি করা হয়েছে।৬

নাট্যকলাতেও রাগ, দ্বেষ, হিংসা, আক্রমণ, আনন্দ, সমর্পণ প্রভৃতিকে অরণ্যচারী প্রাণীদের মতই হুংকার, দৌড়-ঝাঁপ ও উল্লম্ফন দ্বারা মানুষ ক্রিয়াপ্রধান ও সজীব ক'রে তোলে।

বেদী শিল্পেও (যজ্ঞের মঞ্চ) যে পশুপাখীর অবদান আছে তার প্রমাণ কল্প-সূত্রের পরিশিষ্ট 'শুল্বসূত্র' গ্রন্থে পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে—"চতুরস্র শ্যেনচিৎ বেদী শ্যেন পক্ষীর ন্যায়, কঙ্কচিৎ বেদী কঙ্ক পক্ষীর ন্যায় ও কূর্মচিৎ বেদী কূর্মাকৃতি ক'রে প্রকৃত যজ্ঞবেদী নির্মাণ করা হ'ত। এই চিতিগুলিই ইট দিয়ে তৈরী হ'ত পরে তা মন্দির, মসজিদ ও গীর্জার রূপ নিয়ে দেখা দেয়

হিন্দু দেবতা গণেশ মূর্তিতে এবং অনেকানেক দেবদেবীর বাহন বিবরণে ইতর প্রাণীরাই প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত। আবার, হিন্দু ধর্মাবতার তত্ত্বের বিবরণ যতটা গুরুত্বপূর্ণ এই প্রসঙ্গে সেটা ততটাই প্রমাণাকারে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে এক কুকুরই স্বর্গের পথে নিয়ে গিয়েছিল বলে এক মহাভারতীয় আখ্যান আছে

পশুদের কামড়েরই হয়তো এক সমুন্নত রূপ বালা, আংটি তোড়া এমনকি কণ্ঠহাররূপ অলংকার। গাছের-ডালে-পা-ঝুলিয়ে-বসে-থাকা হনুমানের সঙ্গে গাছের লগ (Log) থেকে তৈরী টেবিল-চেয়ারে বসে থাকা ভাবময় বাবুমশাইয়ের মূর্তির সারূপ্য বোধ হয়, চোখ বুজেও দেখা যায়।

ইংরাজীতে একটি কথা আছে "If you want to love me, love my dog first"—এখানে মানুষ-মানুষীর প্রেম প্রস্তাবের কলা-নমুনায় কুকুরকে বিপুল গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এতক্ষণ, মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন অংশের উদ্ভব ও

উল্লেখে এসব প্রাণীদের কিরূপ অবস্থান আছে এবং তার মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে তাদের স্বাতন্ত্র্য বা সেতুর কতটা ঘনিষ্ঠতা আছে আকর গ্রন্থাদি অবলম্বনে তারই এক প্রামাণিক আলোচনা করা হল। এবার, আমাদের সংস্কৃতির এক বিকৃত ফসল, তথা অপসংস্কৃতির ব্যাপারেও আলোচনা করা যাক।

অনেক সময় ক্রোধের কারণ ও স্নেহের মাত্রা ছাড়ালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আমরা 'হনুমান', 'বাঁদর', 'গরু' ও 'গাধা' বলে গালাগালি দিই। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ',—তো এক মাইকেলী শিরোনাম! প্রতিপক্ষকে আক্ষরিক 'মাছি মারা' বা 'মশা মারা' করে দেওয়ার জন্যে হুমকি দেওয়া হয়। ইংরাজীতেও 'Pulldog tenacity' dogtired, Lion's share, white Elephant প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর প্রয়োগধারা দেখা যায়। "No body is a hypocrat before his dishes" এর কি অনুবাদ: "ভোগে সকলেই রোগহারা এবং তার বিভূতির সুযোগে সকলেই পালব" বা "A fish always rots at the head." —এর অন্যার্থে কি "দিবে হইলে সর্বাঙ্গে কোথায় বাঁদি ভাগা?" তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের ধরনে মঃ গোর্কি পরম ধিক্কার দিয়ে লিখেছেন,—"আমি তো রাস্তার একটি নেড়ী কুত্তা রে! তার উপর আবার লেজকাটা। আর বেশীর ভাগ লোকই ঘরে পোষা কুকুর—লেজে তার রাজ্যের চোরাকাঁটা লেগে আছে,—বউরে, ছেলেরে তার হাবোভাবো ছাইভস্ম। ওই কুকুরগুলোর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান তার পুপরিটুকু।"৮ "মাছি তো আর নেকড়ে নয় যে বন্দুক দিয়ে মারবে।"৯ ইত্যাদি। "Parliament-গুলো সব গুয়োরের খোঁয়াড়" ও "যত শিক্ষিত লোকের সাথে কথা বলি, তত কুকুরের প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যায়—ইত্যাদি ইত্যাদি বামপন্থী মন্তব্যগুলির মধ্যেও ইতর জীবজন্তুই উপমা হিসাবে স্থান পেয়েছে; দেব-দেবতা, বা সমাজের কেষ্ট-বিষ্টুরা সেখানে কক্ষে পান নি।

বৈষ্ণবদের দিব্যভক্তির গীতিমালাতেও পাই—

"কবে হবো বৈষ্ণবের পথের কুকুর
এঁটো দিয়া ভাড়াইবেন বৈষ্ণব ঠাকুর.....ইত্যাদি

অতএব আমাদের সকল সংস্কৃতিতে ইতর জীবজন্তুরা ছিল, আছে ও থাকবে অনস্বীকার্যভাবে ঘনিষ্ট হয়ে এবং কোনও মহত্ত্ব-বোধেই "ইতর"কে পুরাপুরি বাদ দেওয়া যায় না, যাবে না।

এই প্রসঙ্গেই K. Ogden এর উক্তি, "The Late war had adulteraied our tongue with strange words" (Basic English—G. H. Vallins in Good English P. 7.)
ও এক বিশেষ নির্দেশনায় Shakespeare এর উচ্চারণ—"We all are proud of the democratic freedom of our language and secretly regret that it is not an autocracy."

ইতর থেকেই উদ্ভূত, অন্ধকারের গর্ভেই উষার অভ্যুদয় ও ফুলের সকল সুষমা মাটীরই সোঁদা গন্ধে বিমিশ্র থাকে।

তথ্যসূত্র :

১. সুকুমার সেন : ভাষা ও বাংলা ব্যাকরণ
২. Elin and Segal : মানুষ কেমন করে কথা বলে :
৩.
৪. স্বামী প্রজ্ঞানন্দ : সঙ্গীত ও সংস্কৃতি
৫ " "
৬. স্বামী প্রজ্ঞানন্দ : সঙ্গীত ও সংস্কৃতি
৭. P. Acharyya : History of Indian Temples
৮. মঃ গোর্কি : পৃথিবীর পাঠশালায়
৯.

ঘাটাল মহকুমার সাহিত্যচর্চায়
'সৃজন' দুনিবার গতিতে
এগিয়ে চলুক ঃ

উত্তম হুদাইত

গ্রাম [] জয়রামচক্
পোঃ [] পাঁচগেছিয়া
মেদিনীপুর
৭২১১৪৮

ভালোবাসা

নিলয় মিত্র

ফিরিয়ে দেওয়া হল তাকে সব
ছেঁড়া উর্দি, রাইফেল, হেলমেট, ক্যাভারস্যাক
ডায়রী এবং একটি নতুন জীবন ;
স্মিত হাসিতে তরুণী ডাক্তার
তার হাতে হাত রেখে বললে,
'স্বাধীনতার জন্য সঞ্চয় করো ভালোবাসা'।
সৈনিকের বাম উদর আর হৃৎপিণ্ডে
ছিল শত্রুর বিষাক্ত ঘৃণার ক্ষত
সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যু ক্ষুধা
তরুণী ডাক্তারের কাছে তরুণ সৈনিক
পেল স্বাধীনতার জন্য ভালোবাসা
ভালোবাসা'র জন্য স্বাধীনতা
যুদ্ধভূমিতে ফিরে যাবার বিদায় চুম্বন।
তারপর বহুদিন পরে দেখা হয়ে গেল ফের.
নিবিষ্ট প্রেমিকের মত তরুণ সৈনিক পাশ ফিরে শুয়ে
ফলন্ত ফসলের বুকে শরীরে বারুদের গন্ধ নিয়ে
উপত্যকায় প্রতিরোধের মত।
পাহাড়ী ঝুলের ঝাড়ে প্রেমিকার হাসি মেখে
যেন অপেক্ষায় তরুণী ডাক্তার
একরাশ গোলাপের ঝাড় হয়ে হাসছে স্বাধীনতায়।

* মূল কবিতা চিনের কবি ঝ্যাং সিহ বিনের। জন্ম ১৯৬২ সালে। ১৯৩৭ সালে সাম্রাজ্যবাদী জাপানের বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে সৈনিক হিসেবে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

অন্য জীবন

তপনজ্যোতি মাঝী

এখন কি ভাবে বেজে উঠব।
এখন কিভাবে কল্পনার পোষাকগুলি টাঙিয়ে দেব চাঁদের আলোয়।
প্রত্যহ আগুনের ভিতর দিয়ে হাঁটি……
শুদ্ধ হয়ে যাই।

আগুন কি রিক্ত করে ?
আগুন কি ঋদ্ধ করে নিজের মতন ?
কোন কোন দিন বিদ্যুৎ চলে গেলে……
মোমের আলোয় এসে বসি।
বড় স্নিগ্ধ সেদিন আগুন।
গলে যায় ভিতরের দ্রোহ…
অন্য মানুষের গলায় কেউ ডাকে
অন্য গান জেগে ওঠে শরীরের কোথাও।

আগুন পেরিয়ে পেরিয়ে প্রতিদিন
একা একা হাঁটি

বিরহী পাখি

বিরূপাক্ষ পাণ্ডা

বিরহী পাখি কাজল চোখে
সময় সহচরী হয়ে
উড়ে যায় শূন্য আকাশের দিকে।
আকাশ থেকে গড়িয়ে পড়ে জল,
মাটি চঞ্চল হয় শস্য অনুকূলে
ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় বিপদের ঘর
গড়ে তোলে সাহসী সেতু।

বিষণ্ণ বেলায় ঐ পাখি
ফাঁকা মাঠের শস্যকণা খেয়ে
টাঙিয়ে রাখে প্রীতির সানিয়ানা।

বিরহী পাখি কাজল চোখে
নদীর ছলধারা হয়ে
আকাশ থেকে নিয়ে আসে প্রসন্ন সোহাগ।

আমি কি যেতে পারি

দুরন্ত বিজলী

এখানে নগরীর কোল ঘেঁসে শুয়ে আছে নদী,
নদীর বুকে ঘুমিয়ে আছে দ্বীপ,
অন্ধকার ছিঁড়ে খুঁড়ে আলো আলো স্বপ্ন ;
আমার পাশে শুয়ে আছে আমার নারী,
নারীর বুকে ফসলের সুপ্ত মধুরিমা,
ঠোঁটের পাতায় মৃদু আলো।
অন্ধকার দূরে যায়, মেঘও দূরে যায়,
নদীর রুপোলি ঢেউ জ্যোৎস্নায় ঝিক্‌মিক্ করে,
আমার নারী আমাকে নিয়ে যায় রক্তের ভিতর,
এখানে বীজ বুনেছি বলে
ফসলের সম্ভাবনায় চেয়ে থাকি মাটির বুকে,
জলে ও পরিচর্যায় গড়েছি যে নতুন বাগিচা
তাকে ছেড়ে যেতে পারি বলো ?
বলো আমি কি যেতে পারি
আজ, কাল বা পরশু ?

বসুন্ধরা নতুন করে সাজুক

কৃষ্ণা দাস

আমি অপেক্ষায় আছি
কতদিন ধরে
একটা ঝড়ের !
ভয়ঙ্কর তোলপাড় করা
বিরাট একটা ঝড়
এবার উঠুক ।

অনেক দিনের জমা—জঞ্জাল
উড়ে যাক—লহমায় ।
নড়ুক মনের আগাছা-শিকড়
ঘুণধরা-নোনাপড়া নড়বড়ে দেওয়াল
হোক্ ধূলিসাৎ ;
মনকে করুক উথাল-পাথাল !
ঝলসে উঠুক—বাজ !!
শঠতার বুকে ।

কাঁথা-মুড়ি দেওয়া নীতি-বুড়োর
ল্যাজ ওয়ালা ছা গুলো
মরুক মুখ থুবড়ে !
তারপর.....

আবার নতুন করে সাজুক—বসুন্ধরা ।

লোকটা

বিশ্বজিৎ অধিকারী

লোকটা এখনো স্বপ্ন দেখে
একদিন না একদিন তার মাতৃভূমি
সোনায় সোহাগা হবেই হবে।
লোকটা বিশ্বাস হারায় নি আজও
সেই ছোটবেলা থেকে বেছে নেওয়া তার পতাকার রং
নিজের রক্তের মতই নির্ভেজাল, পবিত্র।

অথচ লোকটার পারিপার্শ্ব পালটে যাচ্ছে দ্রুত
সময়ের স্রোত আর রৌদ্রের তাপে
পরিচিত মুখগুলো অচেনা হ'য়ে উঠছে ক্রমশঃ
ক্রমশঃ সুকৌশলে সরে যাচ্ছে মিছিলের সাথী
আর প্রথম যার হাত ধ'রে সে হাঁটতে শুরু করেছিল—
আশ্চর্য, তাকেও সে খুঁজে পাচ্ছে না আজকাল!

তার ঘরে গোটা দুই বাচ্চা আর তার হাড়-সার বউ—
লোকটা মরলে যেন তারা দুঃখের বদলে সুখ পাবে।
তবুও লোকটা আজও স্বপ্ন দেখে চলে
তবুও লোকটা আজও বিশ্বাস হারায় নি :
একদিন না একদিন সোনায় সোহাগা হবে দেশ।

জীবনের স্বাদ

বঙ্কিম মাঞ্জী

অনেকদিন অনেক স্বপ্ন দেখেছি
হৃদয়ের অনন্ত গগনে
মুক্ত বাতাসের অনেক সৌরভ নিয়েছি !
রেঁস্তোরায়, মানুষের ডাস্টবিনে খাওয়ার,
বাবুদের টেবিলের চিংড়ির কাটলেট ;
কিংবা ছা-পোষা মানুষের
দু বেলা দু মুঠো ভাতের !

সর্বত্রই সৌরভের ছড়াছড়ি !
সর্বত্রই ভালবাসার বাড়াবাড়ি ।

সাধারণ ছা-পোষা জীবন
অনাবিল আনন্দের অনন্ত উৎসধারা ।
আমি হৃদয় ভরে নিয়েছি ।

কোথাও যাব না আমি

অসীম শাসমল

পথ চলতে···—চলতে·····
হঠাৎ দেখা হয়েছিল তোমার সাথে ।
সমুদ্রের তলদেশের বৃত্তান্ত
কে জানত সেদিন ?
ক্রমশঃ দেখলাম তোমার রূপ ও প্রতিভা ।

তোমার আকাশে নেই কোন ভয়ঙ্কর মেঘ,
আছে শুধু নীল রঙ আর উড়ন্ত পাখিদের গান।
সেই গানের ঝঙ্কারে বিষণ্ণ মানুষও ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে,
তার মাথার ভেতর ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে হাসি।

পথ চলতে·····চলতে·····
আজ আমার হৃদয় জুড়ে ভাসছে
কেবল তোমারই অলৌকিক মুখ।
তোমার ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছি নিশ্চিন্ত,
যেন আর কোনদিন কোথাও যাব না আমি।

পরজন্ম

পুলক রায়

তোমাকে দ্বিতীয় হুগলী সেতুর উপর রেখে আসি চলো
এলিমেন্টসের ধার ঘেঁষে এযাবৎ দাঁড়ায়নি কেউ
শরীরে শেকড় ছিঁড়ে তোমার বিচিত্র স্রোত হোক
দ্রুতগামী। এপারে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার দিগন্ত বাড়া
ছুঁই
তোমার উড়ান হোক কবির সুদীর্ঘ পরমায়ু
শূন্য হৃদয় জুড়ে বৃষ্টি হোক। দু-চোখ ভিজিয়ে রাখো
জলে
অনুতপ্ত হৃদয়ে মাখো ধুলোকাদা, আর একটু রাখ
অহংকার
জলের শাপ্‌লা-শালুক যেমন রাখে এইটুকু
আর আমি বিশ্রাম নিই। পরজন্ম, এইবার অভিমানটুকু
ভোলো।

এ'সময় হে সময়

.....

অশোক অধিকারী

কাকভোরে নিষ্ঠুর সত্য বলার অপরাধে, আর
কিছু আপত্তিকর শব্দ প্রয়োগের অজুহাতে
এইমাত্র যার পিঠের চামড়া আলাদা করে দেওয়া
হোল, তার জন্যে ভালোলাগার গানের ইদানীং
কোনো অনুরোধ আসে না :
এখন বুদ্ধিজীবী কিছু দাতাল
মেট্রোর সামনের রাস্তায় বলে বেড়াচ্ছে
'প্রশাসন দেখেও কিছু করছে না'
অন্য কেউ বলে যায় --
'বাসি রোদে ভালোবাসা তেতে ওঠে দুঃসময়ে'
কাকভোরে তাই এই ঠেটে যাওয়া
জরুরী হলেও ভালো নয় ;
মিশ্র কথাবার্তাও সুবিধের নয়
শুধু মৃতের শান্তি কামনায়
পূর্বপুরুষদের দেওয়া যায় সফেন পিণ্ড
দেঁতোহাসি হেসে যারা সেজে থাকে হালকা বৈ
উড়ে যায় তাদের নামাবলী
ব্যস্ত রাস্তায় ।
পথ হাঁটে জরুরী সময় ।

তার সংসারের শতদীর্ণ ঘরটা

ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তার সংসারের শতদীর্ণ ঘরটা
শুধু সত্যের খুঁটিতে দাঁড়িয়ে.....
তাই সে বুক ভরে বিশুদ্ধ বাতাস নেয়
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে
নিশ্চিন্তে গভীর নিদ্রা যায়
সুখ-দুঃখ একই বীণার তারে
আনন্দে গান গায়।

তার সংসারের শতভীর্ণ ঘরটা
শুধু সত্যের খুঁটিতে দাঁড়িয়ে
ঝাঁটি ভক্তরা তাকে বুকের অন্দরে টানে
প্রীতির ছাতা তে দাঁড়িয়ে।

অনড় আকুতি

এস. ইউসুফ আহমদ

তোমার একটা ফুলছবি দিও
কাছে কাছে রাখি ;
তোমার একটা দীপ্ত বদন দিও
ভরে রাখি পকেটে।
কতদিন কতদিন তোমাকে দেখি নি :
কতদিন কতদিন কল্পনায় গড়িয়ে গড়িয়ে
তোমার বিদ্রোহী আদল বেমালুম ভুলে গেছি।
.....এখানে রোদ জল ঝড়
করুণ কান্নার ফল্গুধারা
ক্ষীর্ণ ভয়
পথ প্রখর।

এখানে আবেশ রাঙানো আকাশ নেই
ধূসর মরুর মুক্তাবলয়।

আসতে চাও তো এসো
পরিমল পেখম উড়িয়ে
একহাতে বনানীর মর্মর
আর হাতে খরতোয়া তর্জন।

নিরপেক্ষ নেই

হিমাংশু নন্দী

চেতনার তর্জনী তুলে
কে যেন বলছে :
ঘৃণায় দু'চোখ ফিরিয়ে নাও হে
কতকাল আর সংকীর্ণতার গোলকে
ঘুরবে কলুর বলদের মতো।

ভয়ঙ্কর একটা দৃশ্য দেখবো বলে
রুদ্ধশ্বাসে বসে আছি
দর্শকের চেয়ারে।
সমুদ্রের তলদেশ ভেঙে ওঠে
সূর্য দেখবে বলে—
লক্ষ বছরের জমানো বেদনা
তার বুকে ;
সূর্যের চোখ থেকে ঝরে
পড়ে জল
জলবায়ু-মাটি নিয়ে ঘাস-লতা
বৃক্ষ বেড়ে ওঠে।
সৃষ্টির আনন্দ শব্দিত হয়
শাখায় শাখায়
চেতনা আন্দোলিত হয়
প্রহরে প্রহরে।

বিষণ্ণ তুই যা……

দেবাশিস্ ভট্টাচার্য

চাঁদের আলো আজ কিনেছি সেগুন গাছের পাতায়।
যা – বিষণ্ণ, তুই মুখ ধুয়ে আয়
পা ধুয়ে আয় পদ্ম পুকুরে।
আজ আর আমডুবি-পাঁচখুরির হাট নয়,
আমার এক উঠোন মুথা'র গন্ধে পুরোনো দিন।
বিষণ্ণ, তুই যা—
কংসাবতীর কোলে ভাদুর ভাসান দেখে আয়,
আমি আমার মা'কে ডাকি, ঘুমন্ত বাবাকে ডাকি –
অনেকদিন ওরা চাঁদের পরমান্ন খায় নি :
বিষণ্ণ এবার তুই যা ….।

একটি সত্য সংলাপ

শক্তি সিংহ

যুদ্ধরত সৈনিক, আমার দিকেই—
অস্ত্র তুলে ধর।
আমিই তোর একমাত্র শত্রু :
তখন অমল অবোধ ছিলি তুই—
তোকে বলেছিলাম—
'দুধ দেবো, ভাত দেবো,
চাঁদের কপাল দেবো—'
কিন্তু, কিছুই দিইনি।
তোর মুখ থেকে রোদ্দুর সরিয়ে নে—
শত্রুদের সূর্য সহ্য হয় না।

ডাকবাংলোর সংসার

অনুত্তম বিশ্বাস

শিবদাসবাবুর টাকার পাহাড় ছিল কলকাতায়,
তার নামে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে বসে' জল খেত।
সেই শিবদাসবাবু প্রতিদিন দুপুরের মাংসভাতের পর
রাতের দীর্ঘায়িত সহবাসের কল্পনায় আপ্লুত হয়ে বৌ-কে বলত,
'সেলাই-টেলাই রেখে এখন, লক্ষ্মীটি, একটু ঘুমিয়ে নাও।'
শিবদাসবাবুর কথায় শিবদাসবাবুর বৌ-এর
কোন ভাবান্তর হত না, কেননা ততদিনে তার
কোল আলো ক'রে খোকাখুকুরা এসে পড়েছে।
পৃথিবীর মেয়েরা ছিল এই রকমই,
সন্তান ও স্বামীর মঙ্গল ছাড়া তারা আর কিছুই চায়নি।
পুরুষ মানুষগুলোই ছিল আলাদা, তাদের কানের কাছে
কেবলই মহাকালের নিষেধমন্ত্র ধ্বনিত হত,
'অন্যায় কোরো না, অন্যায় কোরো না, অন্যায় কোরো না',
কে শোনে কার কথা, তাদের প্রতিটি ভঙ্গীতে ও কথায়
মুহুর্মুহু ঝলসে উঠত অন্যায়।
ক্রমে, পৃথিবী থেকে দূরে, অথচ পৃথিবীরই মধ্যে
আমরা খুঁজে পেলাম ইস্কুল-আপিস-কাছারি থেকে মুক্ত
ডাকবাংলোর এই অলৌকিক সংসার।
এখানে, টাকা নয়, বর্ষার বৃষ্টি, শরতের মেঘ আর
বসন্তের বাতাসই এতকাল আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে।
পশ্চিমের থৈ-থৈ পুকুরে আমাদের ছেলেপুলেরা
ছিপ্ হাতে নেমে, মাছ ধরার বদলে, মাছেদের সঙ্গে
সাঁতার দেয়, গল্প করে, খেলাধুলা করে।

দুর্বাটে কয়েকজন মেয়ে সারারাত জাগিয়ে
পরপুরুষের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করেছিল,
ডাকবাংলোর সংসারে একদিন ফিরে আসতে হয় তাদেরও,
আর আমরা হাঁ হয়ে দেখি, তারা আদপে মেয়েই নয়।
সমুদ্রমন্থনের গল্প মনে পড়ে।
যে-মোহিনীকে দেখে দৈত্যরা আর মহাদেব স্বয়ং
কাতর হয়ে পড়েছিল, এক জবরদস্ত পুরুষ ছিল সে-ও।

ডাকবাংলোর সংসারে
খ্যাতির লোভে কেউ কবিতা রচনা করে না, তবু
কোনদিন যদি এখানে একটিমাত্র কবিতাও রচিত হয়,
সেই কবিতা অবশ্যই হবে সরল, প্রাঞ্জল, সত্যভাষী।

প্রেম, ফিনিক্স

অঞ্জনা ৩

মরুপথে যেতে যেতে
জ্বলকে করি গালাগাল
অবিরাম।

পূর্ণিমা-চাঁদের জ্যোৎস্নায়
তাতা শরীর পুড়ে
ফোস্কা।

রেলিং পিছলে পড়া
বিপন্ন ডালিয়াকে বলি—
'তুই তো চিরটাকাল
শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বাড়ি চেয়েছিস।'

কিন্তু, সে দু হাত বাড়িয়ে
আমার শ্বাসরোধ করে ক্যানে!

স্মরণ

.....

ষষ্ঠী দত্ত

অনেক দিন পরে এলে প্রিয়নাথ
অনেক কাল কেটে গেল অনেক বছর
এখন আমার শরীর জুড়ে শীত,
পত্রহীন শাখা-প্রশাখা, হা-হন্যে
সকাল হতে রাত ;

অনেকদিন পরে এলে অ—নে – ক বছর পর
ক-বে কোকিল ডেকেছিল ভোরে
পাতা নড়েছিল হাওয়ায়
লাল পলাশের পাপড়ি ছুঁয়ে ছুঁয়ে
ভেঙেছিল ঘুম স্মরণে আসে কি ?

স্মরণে আসে না, ফল সবুজের সমারোহ
আগুনের ফুলকি, ঘুম জাগানো মুখ
স্মরণে আসে না চাঁদ-ডাকা আয়েসী সময়

অনেক দিনের না দেখা তুমি, অনেক কালের
না দেখা চোখ, দৃষ্টিহীন.....দৃষ্টিহীন.....
অন্ধকারের যৌবন চিরে স্বপ্ন আনা, স্বপ্নেরা সোহাগ
কোনটা প্রথম স্মরণে আসে না.....

কর্মখালি

গুরুপদ মজুমদার

একজন দক্ষ স্থপতি চাই
জনগণের বিশ্বাস, তার অভিজ্ঞতা
এবং নিপুণ ড্রয়িং নেনে ক্রমশঃ
উর্দ্ধে উঠবে মানবিকতার সৌধ—

সকালের সোনালী রোদ হেসে উঠবে, ফুলের পাতা
বিকশিত হবে বিশ্বাস ও স্নেহের পলেস্তরায়
তার সাবলীল ঋজুতা বিস্ময়ে আবিষ্ট করবে জনমন
স্বপ্ন থেকে বাস্তবে—প্রজাপতির রঙ ছেনে
সব ক'টি হৃদয় হবে রঞ্জিত।

মূল্যবোধের কঠিন ভিত খুঁজে পাবে ইস্পাত দৃঢ়তা
বিশ্বাস-শ্রদ্ধার মশলায় প্রাণের ভিতর আঁকা হবে ছবি
স্থপতিকে দিবে উৎসাহ থাকবে কিন্তু স্তাবকতা নয়
দেবতা নামক কল্পিত কলেবরের
সম্পূর্ণ বিপরীত—
চাই একজন দক্ষ স্থপতি এবং এখুনি এই মুহূর্তে……।

শিলাবতী

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এই সেই শিলাবতী। বয়ে চলেছে একাকিনী, অবিরত।
অভিমান ছুঁয়ে রয়েছে ওর মুখ
শরীরে চেপে রয়েছে এক সাহসী ক্ষোভ। কলতানী—
কেন আজ কেরাও আমাকে? তীর থেকে
ছুটে আসা বিকেল-বাতাসে আউপাতা কাঁপে
কম্পনে কাঁপে আমার সারাটা শরীর।

ফাঁসির দড়ির মতো ঝুলে থাকা সূর্যের ক্ষয়িষ্ণু আলো
আর পথ চেনায় না আমাকে।
ভালবাসার শব্দশৈলী ডুবে রয়েছে শিলাবতীর শরীরে—
মেদিনী যেমন সব ক্ষতচিহ্ন ঢেকে রাখে নির্বিকারে
অবিকল তেমনি।

মনে পড়ে শিলাবতীর শরীর ছুঁয়ে সেদিন সন্ধ্যায় বলেছিলে
ছোট্ট ঘর বাঁধবে তুমি আমাকে নিয়ে। আজ
অর্থের প্রাচুর্যে ভুলেছ তোমার পণ, চলে গেছে বহু দূরে
এখানে আমি বুকের ভিতরে গড়ে চলেছি শিলাবতী।

মৌলবাদ বনাম ধর্ম

.....

হাফিজুর রহমান

মৌলবাদের ঝাপ্‌টায় ধর্ম কখন উড়ে গেছে,
বুকের উর্বর ক্ষেতে উচ্চ ফলনশীল
কোন ফসলের চিন্তার
প্রভাব পড়েনি।
ওখানে নির্জলা মিছে কথায় ধর্মের নামে
আশু প্রচারের প্রগল্‌ভ
পক্ষ বিস্তার।
নিরেট মস্তিষ্কগুলোতে ভুলের ফসল বুনে
ঈশ্বরের থেকে দূরত্ব বাড়াবার
এ এক দারুণ অপকৌশল।
ঈশ্বর আর মানুষে আজ
দারুণ ফারাক—মানুষের সাথে
মানুষেরও।
সব কিছুর মাঝে ঈশ্বরের উপলব্ধি
আজ ধর্ম নয়;
ধর্মের ভূখণ্ড নিয়ে হিংসা-বিদ্বেষ
মানবতার ঘরে আগুন জ্বালে।
কূট-কৌশলী বিচক্ষণ রাজনীতিক
ধর্মপ্রাণ সাজে ভক্তির অশ্রু ধারায়,
বগলে লুকানো থাকে তার
দাবার ঘুঁটি—মসনদের চিন্তা।
তাই ধর্ম নয়, ভক্তি নয়, নয়
ঈশ্বরোপলব্ধি,
মৌলবাদকে ধর্ম বলে চালিয়ে
ধর্মপ্রাণ সাজা,
যাত্রার রাজার মতই আসর থেকে
ফিরে এসে সে এক
আশ্চর্য সাধারণ মানুষ।

আমরা মানুষ হতে শিখলে

প্রশান্ত মাণিক

আমরা মানুষ হতে শিখলে
পৃথিবীর জঞ্জাল সরে যাবে।
রক্তিম সূর্যের আলোয়
ঈর্ষা বিদ্বেষ জ্বলে গিয়ে
স্নান করা পৃথিবীটা
নতুন করে জাগবে।

আমরা মানুষ হতে শিখলে
ভাসবে না আর
বাতাসে বারুদের গন্ধ
আকাশে উড়বে না
ক্ষুধার্ত শকুন
দেশের নেতিয়ে পড়া মানুষগুলোও
জেগে উঠতে পারে
আমরা মানুষ হতে শিখলে।

বিশ্বাস নির্মাণ

পার্থ ভট্টাচার্য

রক্ত জমে পাথর হয়? হয়েছিলো সুবোধ কল্পনে।
সেই ত্রাণ শিবির, সেই আশ্বাসস্ত্রাস দিন।
কিংবা বিশল্যকরণী ভক্ষণ, কিংবা অকাল ভ্রূণমৃত্যু।
তাতো জানতাম না!

আমি তো জানি ছোরা এবং ছুরি।
আমি তো জানি শিলের বুকে নোড়া।
আমি তো জানি ভালো এবং ভালো।
আমার কেন বিশ্বাসে হাত দাও?

বিশেষ ঘোষণা

দেবু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতাপ সিংহের মহড়া দিয়ে
ভালো দেখাবে ব'লে মঞ্চে এলেন
মহম্মদ বিন্ তুঘলক
আর, ঘোড়া পাওয়া গেল না বলে
সাপ্লাই দেওয়া হ'ল ভেড়া

মৃত ভেড়ার আবর্জনা সাফ করতে
কেউ কেউ হ'ল শকুন
কেউ কেউ হলের মধ্যে বসে দাঁড়িয়ে ছুটে
শুরু করলো বেড়ায় হট্টগোল

শুনুন, মাননীয় দর্শকবৃন্দ :
এ আমাদের কেতাদুরস্ত প্রযোজনা
টিনের বাক্স খেল্না অস্ত্র কাঠের মঞ্চ
—এ দেখেই বয়স বেড়েছে আপনাদের
সুতরাং, ভালো না লাগলে যেতে পারেন
টিকিটের মূল্য ফেরৎ হয় না

খাঁচার ভেতর

জয়দেব ঘড়া

শোষণমুক্ত সমাজ চাই।
সমাজতন্ত্র চাই।
মেহনতী মানুষ জেগেছে
মিছিলে সারি সারি মুখ
মুষ্টিবদ্ধ হাত, প্রত্যয়ে উজ্জ্বল
অগণিত চোখ।

দিন যায়, রাত আসে
প্রহর গড়ায়—
মিছিলে লোক বাড়ে
মুহুর্মুহু স্লোগানে দিগন্ত কাঁপে
অথচ মানুষের বুকে অন্ধকার খেলা করে।
সাহস নেই, ভালবাসা নেই—
মানুষের জন্য মানুষের বেদনা নেই—
ভালো দানাপানি পেয়েও পাখিটা
খাঁচার ভেতর ডানা ঝাপটায়.....।

অভিনন্দন

বরুণকুমার চক্রবর্তী

ও রতন
বকুল ফুলের মতন
সন্ধ্যা তারার মতন, ও রতন

ঘরের মধ্যে ঘর
মনের মধ্যে মন
ঋদ্ধি মনন, ও রতন

সুখ দুঃখের গহন
মরণ আর বাঁচন
সংস্কারের বাঁধন
ছিঁড়তে গিয়ে কাঁদন
ও রতন, থামে না তবু চলন।

ও রতন, বোধন
কাশের বনে নাচন
বসে আছি নীলকণ্ঠের মতন
ও রতন
অপ্রতিম অভিনন্দন

ফানুস

স্বপনকুমার মাঝী

এখন নদী হারাচ্ছে তার স্রোত
পাখি হারায় বন, আকাশ তার স্নিগ্ধতা ;
আর মানুষ—হারাচ্ছে তার বিবেক।
শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে একটাই ঋতু—
কাঁচের ঘেরাটোপে জন্ম-মৃত্যু
একটাই সিঁড়ি শুধু ওপরে ওঠার
যে কখনো দেখেনি—
পাতার ফাঁকে সূর্য-নাচে,
শ্যামলী বাতুর ঘাড় বাড়িয়ে
সোহাগ জানায়,
যে কখনো শোনেনি—
জোনাকির হাজার রাতের বাতি জ্বেলে
এলোচুলে নির্জন চাঁদের গল্প,
মাসি-পিসি ভাই-বোনের চোখের জলে
যার কোনদিন চোখের কোণ ভেজেনি
সে কোথায় শিখবে স্বার্থত্যাগ ?
মোজাইকের উপর কৃত্রিম মাটিতে
হরমনে হাপর দেওয়া শেকড়হীন
এক প্রজন্মের সারি—
বিবেকহীন হাইড্রোজেন ভরা রঙিন ফানুস
শুধু সারি দিয়ে এলোমেলো বাতাসে ওড়ে।

অস্তিত্বের এইসব সেইসব

অজয়কুমার বাগ

দিনগুলিকে, ঊষা-পূর্বাহ্ণ-মধ্যাহ্ণ-সায়াহ্ণ-গোধূলি—এরকম ভাবে টুকরো টুকরো রুটির মত ছুঁড়ে দেওয়া হয় যদি, আমাদের ক্ষুধার দিকে! তাহলে সেগুলি আর পাখি থাকে না, তার জন্য খাঁচার দরকার থাকে না। কিন্তু কেউ যদি, দুপুরের মাঠের দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকতে চায় অথবা পারে—তাহলে সে কী দেখবে? দেখবে বিচিত্র সব পাখী খাঁচাবন্দী হয়ে না কি বৃত্তি বা বিস্তৃতির ঘুরতে চলে যাচ্ছে। তার মধ্যে সে হয়তো ছবিতে দেখা থেকে আদিম টিরানোসরাসের মত সরীসৃপ পাখীকেও দেখতে পাবে।

কেন? অমনভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না দাদা, ওই যে দেখছেন, ঐ জোরটি চুপচাপ বসে আছে, ভিখিরি! যেন ক্ষীরটি মেরে সন্তোষীরটি। কিন্তু, যাই বলি আপনারা, সত্যিই কি নিখিলের থাকা যায়? বিশ্বায়নের করাল যে সর্বনাশা প্রচেষ্টা চলছে—সর্বোক্ষণ—তাতে নিখিলের মরীচিটি কি প্রতিবাদে উজ্জ্বল আকার ধারণ না করে থাকতে পারে। ঐ জোরটিকেই শুধোন না! কিংবা আপনারই প্রতিদিনের একটু একটু করে হারিয়ে যাওয়া আকাশের শুভ্রনীল খণ্ডগুলিকে।

ওকে জিজ্ঞেস করলে ও কিছুই বলবে না, তার থেকে আসুন, এখন থেকে ওকে অনুসরণ করি। ধরে নিন ওর নাম সুবর্ণ, ডাক নাম সোনা। ঐ দেখুন ও ঘুম থেকে উঠেছে। সাধারণতঃ জল বিয়োগ পর্ব সেরে ও আবার ঘুমে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। কিন্তু আজ একটা সাংঘাতিক কাজ ওকে, মাকে না বলে নিজের ১০' ×৮' ঘরে তালা মেরে বেরিয়ে পড়ল; হনহনিয়ে এগিয়ে চলল যেন আজ ওর খুব ব্যস্ততা সমস্ততা; যেন সময়কে টেক্কা দিতে চলেছে। ওর চোখ দুটো এখন জড়িয়ে আছে সদ্য মাসের ঘেমের মত ধানক্ষেত ছোঁয়া হাওয়ায় হাওয়ায়। এখন ও অকর্ষিত ভূমি জলে টইটুম্বুর। আকাশমণি গাছের আড়ে লুকিয়ে লজ্জিত মানুষেরা প্রাকৃতিক কারুকার্য উপহার দিচ্ছে প্রকৃতিকে। সুবর্ণ এসব অগ্রাহ্য

করে এগিয়ে চলে ততদূর, যতদূর পর্যন্ত না গোমড়া মুখোশ ছিঁড়ে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ঠিকরে বেরোয় হাসির ইন্দ্রজাল ছিটিয়ে উঠে পড়ছে অনিবার্য এক আলোচক্রিকা। কত পুরোনো অথচ কত নতুন, কত বিশাল, এক অদ্বিতীয় অথচ সেই সঙ্গে এতই তুচ্ছ যে একটা বনান্তরেখা, একখণ্ড হ্রদমেঘ ঢেকে দিতে পারে তার সারা অস্তিত্বটুকু।

• • • • •

মাথা আর মুখের অর্ধেক ঢেকে দুঃসাহসপুরের প্রশান্ত এল, ওর কাছে। সুবর্ণকে বল পালিশ করতে দেখে বলল 'লাংয়া হয়ে গেছে?' সুবর্ণর কড়া চোখে অবাক ছড়িয়ে ছিল, লাংয়া মানে স্নান করা, বলল, 'নাইনি, কেন?' প্রশান্ত বলল, 'উকিলের কাছে যেতে হবে, মারপিট হইচ্যা আবুল সেখদের সঙ্গে!' সুবর্ণ চোখে রাগ রাগ ভাব। ঘর্ষণে সিদ্ধান্ত নেমে আসতে চায় সী করে, বলতে চায়, 'বাপের চাকর পেয়েচ নাকি,' কথাটা বলবে ও পরে। এর আগে প্রশান্তর একটু পরিচয় দেওয়া যাক। প্রশান্তরা সুবর্ণর ভাগচাষী। সুবর্ণ এমন একজন ধানজমী যারা আজকাল লোকাভের ভাড়ুরে ঠাঁই পেতে পারে। প্রশান্তর নিত্য নৈমিত্তিক কাজ মদ খাওয়া, জুয়া খেলা আর বেশি রাতে বউকে ধরে পেটানো। ধানের ভাগ আনতে বা মাঝে মধ্যে দুঃসাহসপুরে গেলে ছোট ছেলে দুটোর হাত ধরে প্রশান্তর অশোবদনা রোরুদ্যমানা বধূটি সুবর্ণর কাছে এসে, নানা অভিযোগ জানাত। প্রশান্তর হাত থেকে রেহাই পাবার বন্দোবস্ত করে দিতে বলত।

প্রশান্তকে কড়া ধমকধামক দিয়ে, জমি ছাড়িয়ে নেবার হুমকিতে অথবা উপদেশ অনুরোধে কাজ হয়নি। শেষে মাত্র ক'হাজার টাকায় দো-ফসলী জমি ওর ছেলে কার্তিক গণেশের নামে লিখে দিয়ে, প্রশান্তকে বলিয়ে কইয়ে নিয়েছিল—আর কখনো মদ খাবে না, জুয়ো খেলবে না, বউয়ের গায়ে হাত তুলবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। শুনেছিল প্রশান্ত শান্ত হয়ে গেছে, প্রশান্তি নিয়ে চাষ-আবাদ করছে। কিন্তু কিছুদিন পরেই জেনেছিল, সেই কে সেই। তা যা বলতে উদ্যোগ করেছিল, বলল, 'বাপের চাকর আছি নয় তোমার? কোথায় মদ পেয়ে জুয়া খেলে মারপিট করে এসেছে, আর আমাকে যেতে হবে তার টনডেলি করতে—বেরোও এখেন থিকে!'

এরপর প্রশান্তর দাদা অশান্তর ছেলে সুশান্ত আসতে আর না করতে পারে নি সুবর্ণ। তার বাবা মারা যাবার সময় অশান্ত অনেক করেছে। তাছাড়া ভাগচাষী হিসেবে যখনসময়ে প্রায় ঠিক ঠিক ধান দেওয়ায় সুবর্ণ আর তার বাবা অশান্তদের উপর সন্তুষ্ট ছিল। সুশান্ত প্রশান্তকে ওর পরিচিত এক অ্যাডভোকেটের কাছে পাঠিয়ে সুবর্ণ বাজারে চলে গেল। ধীরে সুস্থে মুদিখানা বাজার, ব্যাঙ্ক, গ্যাস এজেন্ট, পোস্ট অফিস, দু একটা বান্ধব ঠেকে গ্যাজানো, পরিচিতদের সঙ্গে মরচে ছাড়ানো হাসি—এসব সেরে ফিরে এল বেলা বারটায়। মাকে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা আর এসেছিল।' 'না' শুনে আশ্বস্ত হয়ে গেল। তারপর স্নান সেরে মায়ের বেড়ে দেওয়া ভাতের থালার দিকে তাকিয়ে কেন যেন হঠাৎ বিড়বিড় করে বলে উঠল—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'। দুধে ভাতের নীচে আণ্ডার লাইন। কী বলতে চেয়েছিল সুবর্ণকে টিউশানির ছাত্রটা জিজ্ঞেস করেছিল।

চঁ! একটা কথা মানুষ হবেন। আপনাদের সঙ্গে আমিও সুবর্ণকে অনুসরণ করেছিলাম—আমি এখন সবজান্তা! কারণ আমি এখন লেখক। তাই জোর দিয়ে বলছি, বিড়বিড় করে প্রার্থনাটা সুবর্ণ শুধু নিজের জন্য করে নি। এবং সেই সঙ্গে তার তিন কন্যা, জপমালা, রত্নমালা, বনমালা স্কারকদের কথা মনে পড়ল। এমন একটা সময় ছিল 'রত্নমালা'র একটা হাসি করে পড়লে যে কেউ লটারীর বাম্পার প্রাইজ পেয়ে যেত। রুক্ষকলি আমি তারেই বলি মেয়েটির মত 'বনমালা'র কালো হরিণ চোখের চকিত চাহনি সুবর্ণদের বয়সী যে কারোর উপর ছুঁয়ে গেলে বিশল্যকরণী সঞ্জীবনী নেমে আসতো। এই রেঃ! আমাদের কথা বলে ফেলছি, অথচ শুধু সুবর্ণকে অনুসরণ করা, ওর কথা বলা—এমনিই তো কথা ছিলো। আসলে আমার, হয়তো বা আপনাদের মধ্যে একজন সুবর্ণ মৌরসী পাট্টায় বসবাস করে, জ্বালায়, মৌজ করে, প্রশান্তি দেয়, দংশায়।

সেরে দেয়ে এক ফাঁকে কাছের কোর্ট চত্বরে টহল দিয়ে আসে একবার সুবর্ণ। পরিচিত উকিলবাবুর আরও পরিচিত মুহুরির কাছে জেনে যায় কেস সাংঘাতিক। প্রশান্তদের বিরুদ্ধে ওরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অভিযোগ তুলে এফ. আই আর. করেছে। ওদের দু'জনের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। শুধু অশান্তর নাম নেই। ক্রু কুঁচকোয়

সুবর্ণ, অনাদির দাদা, যে নিজে মাত্র দেড়কুড়ি মুখোশিকে না করে ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিল, তাও সঙ্গে যেন আসামী। মুক্তি বললেন, টাকা পয়সা দিয়ে যাও, কাল এসো, কি মূলে কেস করেছে সব জানা যাবে। শুনা কথার উপরে দাঁড়িয়ে ভেবে লাভ নেই। সুবর্ণ মনে মনে ভাবে, 'কে কার চিন্তা করে রে শালুলা—' তিন বেলা টিউশানি ছাড়া ঠেঙিয়ে চিন্তা করার মত ফুরসত তো বিলাসিতা। অথচ এই পার্থিব বিশ্বাস বিলাসিতায় মাঝে মাঝে নিশ্চিহ্নে শ্যামলিমা আছে—আজ কতো দিন হলো সেই শ্যামলিমার কথাই ঠিকমত ভেবে উঠতে পারছে না। অপরপক্ষে সুবর্ণ একটা চাকরী পেতে পারতো। তার যা যোগ্যতা অধ্যাপনা নচেৎ ডাঁটসে মাষ্টারি—হ্যাঁ—পেতে পারতো—শুধু দশ বারটা বছর আগে জন্মালে আর তার চাকরী থাকলে কবেই মা শ্যামলিমাকে সে বিয়ে করে ফেলতে মরিয়া করে।

ঘরে এসে একটু গড়াগড়ি দিতে যাবে এমন সময় সুধাংশু এসে হাজির, 'সোনাকা, মেজকাকাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে পালিয়ে এসেছি। বেরিয়ে দেখি পুলিশের জীপ, ওদের একজন সঙ্গে, চেনাই দিবার জন্যে, আমি কুছু মতে.....'। মাথা হচ্ছিল সুবর্ণর—এই বাজারে তারও মাথা হয় তাহলে- বলল, 'তুই ভাত খা'। পাওয়া হলে সুধাংশুকে বলে, 'তুই জানিসনি এই পাড়াতেই একজন গোয়েন্দা পুলিশ আছে, তার কাছে ইমফরমেশন থাকলে এখেন থেকেই তুলে নিয়ে যাবে, কেসটা খুব জটিল, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুদ্ধ জড়িয়ে দিয়েছে। কাল কেসের সকল বের করলে সব জানা যাবে। তোর বাপের নামে ওয়ারেন্ট নেই, তুই ধর পালি যা, বাপকে পাঠি দিবি কাল, পারলে কোথাও পালি যাস। প্রেসাণ্ড যা পারে করুক মরুক। তুই নির্দোষী এসব বড়া পড়লে বেধড়ক পাঁদাবে।'

কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা আর পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা। ঘরঘরিয়ে সুধাংশু বলল, 'সোনাকা আমি এখানে একটু লুকি থাকি, তুমি পবন মিত্রর কাছে যি একটিবার যেয়ে বল, আমু ব্যবসায়ী অনাথ মাইতির ছেলেকে পুলিশে তাড়া করছে। পবন মিত্র'র সঙ্গে পুলিশের খুব হলায় গলায়.....।' সুবর্ণ ব্যস্ত বিব্রত হয়ে ওঠে, পিতৃদত্ত এই বাড়ি ভাড়াতেই তাদের কোনরকম চলে যায়। এখেন থিকে আসামী তুললে বাড়ির দুর্নাম! সুবর্ণ বলে, সময় বুঝে পবন মিত্রর কাছে যাবো, উকিলবাবুর কাছে যাবো, তুই কাট মিগ গিয়ে.....'।

'এই তো, সেলফোন কে আছেন..... ওপাশ থেকে মায়ের ঢং শুনেই সুবর্ণ বুঝল পুলিশ এসেছে সাদা পোষাকে। দ্রুত নেমে আসে সে। পুলিশ দু'জনের একজন ধমকায় সুবর্ণকে, ক্রিমিন্যালদের আশ্রয় দিয়েছেন কেন? অন্যজন ধমকায়, প্রশান্ত মাইতি, সুশান্ত মাইতিকে বের করে দিন শিগ্‌গীর।' খুব রাগ হয় সুবর্ণর। দাঁতে দাঁত চেপে বহিঃপ্রকাশটা আটকায়। দাঁতের এটা নতুন ও অনন্য এক ভূমিকা। তাচ্ছিল্যের হাসির জল ঝেড়ে ফেলার মত ভাবনা ঝেড়ে মেজাজে বলে সুবর্ণ, 'কে আপনারা, কেন এসেছেন?' 'আসামীরা আপনার ঘরে নেই, ঘর রেড করবো?' ক্রোধ তাকে বলায়—'আসামী-টাসামী বুঝি না। সুশান্ত মাইতি বলে একজন এসেছে এইমাত্র। সুবর্ণকে সরিয়ে সিঁড়িতে উঠতে যায় একজন। সুবর্ণ দুহাত বিছিয়ে তাকে আটকায়, 'আপনাদের আইডেনটিটি কার্ড দেখান, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেখান। সুশান্ত মাইতি কিসের আসামী 'জানেন না? ন্যাকা সাজছেন' —পুলিশরা বলে।

আইডেনটিটি কার্ড আর পরোয়ানা দেখতে চেয়ে অমার্জিত স্বরে সুবর্ণ বলে, হুঁ, আপনারা তাহলে সত্যিই পুলিশ, ভুয়া নয়!' তারপর হাঁক পাড়ে—'সুশান্ত, নেমে আয়, দু'জন তোকে খুঁজছে।' তাদের কথা সুশান্ত নেমে আসবে না। পুলিশকে দাঁড়িয়ে থাকার নির্দেশ দিয়ে, বসার ঘরে ঢোকে, সুশান্তর কাঁধে হাত রেখে বলে, ভয় করিসনি, মারবে তো! মারুক, যা সত্যি তাই বলবি.....' তারপর সুবর্ণ যেন উন্মত্ত হয়, দার্শনিক ভাবে বলে চলে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অপরাধ হিসেবে প্রাণপণে অস্বীকার করবি, বলবি, চীৎকার করে বলবি—দাঙ্গা হিন্দুও করে না, মুসলমানও করে না, দাঙ্গা করে বড়লোকরা, রাজনীতিবাজরা—যারা গরীবদের পশুর মত করে টাকা আর পৈশাচিক আনন্দ পায়।

পুলিশের সঙ্গে চলে যায় সুশান্ত। তার চীৎকৃত সকল মুখে এখন দৃঢ়তা অনেকটাই মূর্ছিত। সুবর্ণ এরপর সম্বিৎ ফিরে পায়—এতক্ষণ কী সব করল সে। সে না অন্য, অনন্য কেউ। আয়নায় সামনে ঠেলেঠুলে নিজেকে দাঁড় করায়। 'এ কী! তার সমস্ত শরীরে এত উচ্ছলতা কেন? বিকেলের হলুদ আলো কেন?.....

সে সুবর্ণ—সে কী সত্যিই সোনায় গড়া মানুষ হয়ে গেল, কখন? এই আচম্বিতে? ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ছাদে উঠে যায় সুবর্ণ। ছাদে মায়ের হাতে লাগানো, তুলসী, ডেলিয়া মনসা, মনোরঞ্জনি, পাতাবাহার, ক্যাকটাস, লবঙ্গলতিকার লতা। আনমনে একটা ক্যাকটাসের টব ছুঁয়ে ফেলে সে। আশ্চর্য! আশ্চর্য! ক্যাকটাসটা টব সমেত সোনা হয়ে যায়। টেরাকোটার টব সোনার, অপূর্ব ক্যাকটাসটা সোনার! সত্যিই সোনার? আর দেখুন····· দেখুন গো বাবু-বিবিমশায়েরা সুবর্ণ লোকটা কি সত্যিই পাগল হয়ে গেল? নয়তো ওর হাতে তুলানো বৃষ্টি দিয়ে ধোওয়া নীল বৈকালিক আকাশের পাতে তুলে ধরেছে। যেন কিংবদন্তীর মিস্তাস!

আরে! দেখুন, দেখুন, কে উঠে এসেছে? এই শ্যামলী সোমালী নির্জনতায়। কে? চেনেন না তো ওকে! ছাই সবুজ রুক্ষ শাড়ীতে অজস্র লতাপাতার ছাপ। প্রগাঢ় সবুজ ব্লাউজ, বড় সবুজ টিপ, সবুজ ঝাঁকড়াকুড়ের মত শুষ্ক শুষ্ক কেশদাম, সবুজ বিবন বাতাসে উড়ছে সজীব অস্তিত্বের মত এসেই সমকে দাঁড়িয়েছে, ও যে শ্যামলিমা মণ্ডল। ডাকছে, পুরু পুরু ভোমরকির ঠোঁটে জ্বালানোর প্রস্তুতির মত 'সোনোয়া·····সুবর্ণ····· সুবর্ণময়'

সুবর্ণ, সুবর্ণময় ফিরে দাঁড়ায়, আর্ত কণ্ঠে বলে, 'শ্যামলিমা! আমাকে ছুঁয়ো না। আমি অভিশপ্ত? নীরবতা। নীরবতা। এই নীরবতা ভাঙা যায় ভাঙুক। শুনুন, শুনুন খুব মন দিয়ে শুনুন, শ্যামলিমা বলছে, 'তুমি অভিশপ্ত নও। আমাকে ছোঁও। আমিও সুবর্ণময় হয়ে উঠি!'

সুবর্ণ এগিয়ে আসে, ওদের স্পর্শলোভী সর্বনেশে শ্যামলিমাকে স্পর্শ করতে গিয়েও সঙ্কুচিত হয়, বিচলিত হয়—এই প্রাণবতীকে এই সম্ভাবনাময়ীকে স্পর্শ করার অধিকার কি তার আছে হবে—এই ভেবে?

মনীশ বেঁচে নেই

তারাশঙ্কর পাণিগ্রাহী

সারা রজনীগন্ধার মালায় মনীশকে অনেক বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে। চারদিকে রাশি রাশি ফুল। ধূপের ধোঁয়ায় ভক্তিরসে মন্দিরের পবিত্রতা। সারাদিন ধরে নানা মানুষের আনাগোনা। সারাটা বাড়ি ঘিরে এক শোকের ছায়া। আজ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজনের ভীড়। অনেক মানুষের ভীড়ে মনীশ প্রায় সারাদিনই হারিয়ে গেছিল। স্নেহে, স্মৃতি-তর্পণে, পবিত্র বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যেও মনীশকে আজ মানা-দিনই খুঁজে পাচ্ছি সুনন্দা। মাত্র আট বছরের একমাত্র আদরের দেবলের হাত ধরে পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধের খুঁটিনাটি অনুষ্ঠান সবই সেরেছে সুহাস। মনীশের চিরকালের নিজের বলতে তেমন আর কেউ নেই। কেবল দূর সম্পর্কের কিছু আত্মীয় স্বজনই ছাড়া।

সুনন্দা সেন মনীশের একমাত্র কাছের মানুষ ছিল। দেবল একমাত্র সন্তান। অবশ্য সুহাস মিত্র মনীশ সেনের মন থেকে অনেক চেষ্টা করেও অকারণ সন্দেহের বীজ উপড়ে ফেলতে পারেনি আজ মনীশ সুনন্দার দরজা চৌকাঠের বাইরে। প্রায় দশ বছরের সংসারকে দু'হাতে দুমড়ে মুচড়ে মনীশ চলে গেছে। সুনন্দার বুকে মুখ গুঁজে আর কোনদিন সে তার বাড়ীর বাঁচলে চোখের জল মুছবে না। শীতার্ত গভীর রাতের নিস্তব্ধ প্রহরে আর কোনদিন শোনা যাবে না মনীশের কাঁপা কাঁপা চাপা কণ্ঠস্বর—"সানু, ঘুমিয়ে পড়েছো?" না শোনার ভান করে কপট নিদ্রায় অভিনয় করতে হবে না সুনন্দাকে শরীরটাকে টান করে শুয়ে থাকলেও কেউ আর তেমন করে বুকের মধ্যে টেনে নেবেনা তাকে।

সুনন্দার ভাবনাগুলো এই মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ছে অজস্র ফুলের পাপড়ির মত। তাতে সেজেছে থাক্ না থাক্, কিছু এসে যায় না।

গভীর নিশীথে বাড়িটা ঝিমুচ্ছে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের শেষে সবাই ফিরে গেছে। ওপরে শোবার ঘরে দিব্যি ঘুমোচ্ছে দেবল। নীচের ড্রইং রুমে সু-সজ্জিত মনীশের প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে সুনন্দা। ফুলের অনেক রাঙা পদ্ম সুনন্দার কাছে কাছেই ছিল। সারাদিন অনেক কাজকর্মের শকল গেছে তার ওপর দিয়ে। অতিথি আপ্যায়ণ থেকে শুরু

করে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের খুঁটিনাটি সবকিছু কিছুক্ষণ আগেই সে সিরে নেবে তার মিউ আলিপুরের ফ্ল্যাটে। যাওয়ার সময় চাপা গলায় জিজ্ঞেস করেছিল,—'তোমার ভয় করবে নাতো?

সুনন্দা এই প্রশ্ন শুনে কিছুটা বিস্মিত হয়েছিল। মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল—'ভয় করবে কেন সুহাস? মনীশ তো আমার পাশেই আছে। ঠিক ছায়ার মতো'। মনীশ সত্যি সত্যিই সুনন্দার পাশে ছায়ার মত ঘুরছে আজ দশ বার দিন ধরে। সুনন্দার মনের মধ্যে ডুব দিচ্ছে বার বার। নাগাল পাচ্ছে না।

মনীশ সুনন্দার মনের নাগাল পেতে তেমন চেষ্টাই করেনি কখনো। এই তো সেদিনের কথা।.....মনীশের চীৎকার চেঁচামেচিতে ফ্ল্যাটের অন্যান্য বাসিন্দারা ছুটে এসে ওদের দরজার সামনে ভীড় জমিয়েছিল। তেমন কোন কাণ্ডকারখানা নয়। দেবলকে কোন স্কুলে ভর্তি করানো হবে সেই নিয়ে সামান্য কথা কাটাকাটি। মনীশ চাইছিলো দেবলকে ওদের কাছাকাছি ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তি করাতে সুনন্দার ইচ্ছে একটা নামী-দামী অভিজাত স্কুল। মনীশ বিজনেস এগজিকিউটিভ। একটা বড় প্রাইভেট ফার্মে কাজ করে। টাকা পয়সার কোন অভাব নেই। স্বচ্ছল সংসার ছেলের পড়াশোনার খরচ যোগানো তেমন কিছু ব্যাপারই নয়। অবশেষে সুনন্দার ইচ্ছে মাটি চাপা পড়েছিল। মনীশ দেবলকে নিজের জিদেই ভর্তি করেছিল কাছের 'হ্যাপি হোম চিলড্রেনস্ স্কুলে।' বাচ্চাদের স্কুলের বাছ-বিচার করতে গেলে অকারণে সময় নষ্ট। বড় বড় স্কুলের সামনে বা দীর্ঘ লাইন ভাঙে মনীশের পক্ষে সামাল দেওয়া অসম্ভব। ভর্তির ঝক্কি-ঝামেলাও কম নয়। ভর্তির পরীক্ষার চাপ তো নয়! ঠিক যেন গন্ধমাদন। তার চেয়ে এই-ই ভাল। চোখের সামনেই স্কুল। সুনন্দা দেবলকে সহজেই স্কুলে পৌঁছে দিতে পারবে ওর নিজের স্কুলে যাওয়ার সময়। ফেরার সময়ও নিয়ে আসতে পারবে অক্লেশে। মাঝে ঐ বড় রাস্তাটায় যা গাড়ীর ভীড়। ওটুকু পথ পার করে দিলেই দেবল একা একাই চলে যেতে পারবে অনায়াসে।

সুহাস মিত্রের সাথে মনীশের কথা কাটাকাটির ব্যাপারটা তো প্রাত্যহিক। অবশ্য সুহাস, সুনন্দা ও মনীশের সাথে একই কলেজে পড়েছে দীর্ঘ তিনবছর ধরে। স্কটিশ চার্চ কলেজের সেই অনাবিল সহজ সরল ভাবনাহীন দিনগুলোর স্মৃতি কখনো ভোলার নয়। বন্ধুহীন

জীবন তেমন কোন আকাঙ্ক্ষার ফুলে সেজে নেই কোন বাসর প্রতীক্ষায়। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে আড্ডা-হিল্লোলের মেজাজে বসে জমিয়ে আড্ডা। পোশাকে। বসন্ত কেবিনের মোগলাই পরোটা। কোন কোন দিন চিনি ছাড়া বাটার টোষ্ট। বেশ কড়া করে ভাজা গরম গরম চা কিংবা কফি। সুহাস প্রায় সময়ই বক্ বক্ করতো। যত সব আনাড়ী তর্ক। দাস্তে থেকে শুরু করে স্থানীয় বাজার দর। কোন বিষয়ই বাদ যেতো না। সব বিষয়েই ওর অনায়াস দক্ষতা সুনন্দাকে আকর্ষণ করতো চুম্বকের মতো।

মনীশ কিন্তু ছিল কিছুটা ধীর, স্থির, সংযত। কিছুটা নির্লিপ্ত। আচার আচরণে তেমন ছেলেমানুষী ছিল না। ছিল না তেমন চাঞ্চল্য। ভাবুক ভাবুক হাসি-গোমরা চেহারায় সুহাসের মতো স্মার্ট না হলেও বেশ হাসিখুশি। ভাল লাগার মতো। তিনজনেরই বিষয় ছিল ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য। মনীশের ইচ্ছে ছিল তুলনামূলক সাহিত্যে এম. এ. পড়ার। সুহাস চেয়েছিল এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস। সুনন্দা অধ্যাপিকা হতে চেয়েছিল কিন্তু বাস্তবে এই ইচ্ছের মূল্য তেমন সোটেনি। মনীশ হয়েছিল বিজনেস এগজিকিউটিভ। সুহাসের ছ' পুরুষের সিমেন্ট ব্যবসা। আর সুনন্দা স্কুল শিক্ষিকা। দশটা-চারটার ছকে বাঁধা জীবনে সুনন্দার কোন আকর্ষণ ছিল না। মনীশ প্রায়ই সপ্তাহ খানেক থাকতো নিজের কাজকর্মে। প্রায়ই ওকে বাড়ীর বাইরে থাকতে হতো কোম্পানির কাজে। অনেকবার বিদেশ পাড়ি দিয়েছিল সে। সারা পৃথিবীর সব দেখেই ওর ঘোরা হয়ে গেছিল। ইচ্ছে ছিল অবসর জীবনে দেশ-বিদেশের এই অভিজ্ঞতার আলোকে বই লেখার। ঠিক শংকরের মতো। শংকর ওর প্রিয় ঔপন্যাসিক। বুক শেলফে শংকরের সব বই ঠাসাঠাসি। মাঝে মাঝে সময় পেলেই মনীশ সেগুলো উল্টে-পাল্টে দেখতো। বার বার পড়া বইগুলো কখনো তার কাছে পুরোনো হ'ত না। মনীশের এই সাধ পূর্ণ হলো না। সুনন্দার বুক ফাটা দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে পড়লো ঘরের আনাচে-কানাচে। গুচ্ছ গুচ্ছ সফেদ রজনীগন্ধার ঝাড়ে লাগলো উষ্ণ প্রশ্বাসের স্পর্শ। মনীশের ফটোর কাঁচে একটা অস্বচ্ছ আবরণ সৃষ্টি হলো।

মনীশ সত্যিকারের অচেনা রয়ে গেলো সুনন্দার কাছে। দীর্ঘ দশবছর পাশাপাশি এক সঙ্গে থেকেও সে ভালভাবে তাকে চিনতে পারলো না বুঝতে পারলো না। ধরে রাখতে পারলো না।

চিরকাল কোন মানুষকে কেউ ধরে রাখতে পারে না। তবু ধরে রাখার উগ্র বাসনা। পরম প্রিয়জনকে কেউ কাছ ছাড়া করতে চায় না। কিন্তু সুনন্দা কি সত্যি সত্যি ধরে রাখতে চেয়েছিল মানুষটাকে? যে মানুষ একতিল ও বিশ্বাস করতো না তাকে। দেবলের পিতৃত্ব নিয়ে যার সন্দেহ ছিল সর্বদা। সুহাস ও সুনন্দাকে মনীশ বিশ্বাস করতো না। ওদের সম্পর্ককে নিয়ে প্রায়ই কুৎসিত ইঙ্গিত করতো মনীশ। সুনন্দার চোখ, মুখ ও কান লাল হয়ে উঠতো।

সুহাস মিত্র সুনন্দাকে বলেছিল, মনীশের মনে যখন এতই সন্দেহ তখন তোমাদের ফ্ল্যাটে আমার না আসাই ভাল সুনন্দা সুহাসের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেছিল—'একথা কক্ষনো মুখে এনো না সুহাস। তুমি আমাদের ফ্ল্যাটে কক্ষনো আসবে না—একথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারছি না। আমি তাহলে বাঁচবো না সুহাস। আমাকে কি তুমি বাঁচতে দিতে চাওনা?' সুহাস সুনন্দার এই আকুতি উপেক্ষা করতে পারেনি। সে প্রায় রুটিন মাফিক সুনন্দার কাছে এসেছে। শুনেছে তার প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটি-নাটির কথা। মনীশ কখনো সুনন্দাকে বোঝার চেষ্টা করেনি।

মনীশ বাড়ি ফিরে প্রায়ই দেবলকে নানা প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতো। কচি বাচ্চাকে সে ধরনের প্রশ্ন করা হয়তো উচিত নয়। দেবল এ সবের কিছুই বুঝতো না। বাবার দেওয়া ফাইভ স্টার চকোলেট মুখের ভেতর পুরে ফ্যাল-ফ্যালিয়ে তাকিয়ে থাকতো বাবার মুখের দিকে। দেবলের বয়স যখন আরো কম ছিল তখনো একই ধরণের প্রশ্ন করতো মনীশ।

সারা ঘরের মধ্যে এই মুহূর্তে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। যে নিস্তব্ধতা মানুষকে অতলান্ত সাগরের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। নীল নীল সাগরের অজস্র ঢেউয়ের হাতছানি। তার মধ্যে ক্রমেই যেন তলিয়ে যাচ্ছে সুনন্দা। তার দু'চোখে ঘন নীল অন্ধকার। সে অন্ধকার প্রাগৈতিহাসিক যুগের। ধরতর শতাব্দীর এই জমাট অন্ধকার জগদ্দল পাথরের মতো সুনন্দার বুকের ওপর চেপে বসেছে। সে কিছুতেই হাল্কা হতে পারছে না। মনীশের ফটোর ওপর তার দৃষ্টি স্থির। মনীশের ঠোঁট দুটো নড়ছে। চোখের পাতাটায় পলক পড়ছে। বাঁকা ধনুকের মতো ভুরুর ওঠা-নামা। মনীশ আবার বেঁচে উঠেছে সুনন্দার পুরোনো

হারিয়ে যাওয়া জীবনের অভিশপ্ত দিনগুলোকে আবার ফিরিয়ে আনার ইচ্ছায়।

সব ইচ্ছার মৃত্যু হয়েছে। তাইই হিম শীতল স্পর্শ অনুভব করছে সুনন্দা। আজ সারাদিন ধরে সুহাস অনেক অনেক সান্ত্বনা দিয়েছে সুনন্দাকে। মনীশ অনেক অভিমান নিয়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। এই স্থূল বোঝাবুঝির তাই শেষ। এতে ছেদ টানা উচিত। এই মানসিকতাকে দীর্ঘস্থায়ী হতে দেওয়া যায় না। হাঁ করে সুহাসের সব কথাই গিলেছে সুনন্দা। তবু কিছুই বুঝতে পারেনি। না, সুহাস মিত্রও ঠিকমত চিনতে পারেনি সুনন্দাকে। মনীশ, সুহাস কেউই ঠিক ঠিক সুনন্দার মনকে স্পর্শ করতে পারলো না। মনীশ শুধু দেহটাকেই পেয়েছিল। আর সুহাস?

ওদের বৌভাতে সুহাস সুনন্দার আঙুলে পরিয়ে দিয়েছিল একটা মুক্তোর আংটি। একগুচ্ছ তাজা লাল গোলাপ ওর হাতে তুলে দিয়ে প্রার্থনা করেছিল পুষ্পিত জীবন। একটা সুখী ছোট্ট সংসার গড়তে গিয়ে সুনন্দা বার বার কেবল হোঁচট খেলো। সংসারকে সাজাতে পারলো না নিজের মনের মত করে। ফুলশয্যার রাতে মনীশের দেওয়া হীরের আংটিটা আজও ওর বাঁ হাতের মধ্যমায় ঝিক্ ঝিক্ করছে। ডান হাতের অনামিকায় সুহাসের দেওয়া মুক্তোর আংটি হীরের মতো উজ্জ্বল নয়। কিছুটা অস্বচ্ছ ও নিষ্প্রভ। দু'টো আংটির ওপর দৃষ্টি স্থির রেখে সুনন্দা অনেকটা সময় অতিবাহিত করলো। রাত বাড়ছে ক্রমশঃ। রাতের গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন মহানগর। ড্রয়িং রুমের উজ্জ্বল আলোর নীচে সুনন্দা নিজের শরীরটাকে যতখানি দেখা যায় তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। শীতার্ত রাতের বুকভরা প্রার্থনা নিয়ে—বসন্তের উত্তরের আশায়। শরীরের উষ্ণতা কেবলই যেন বেড়ে যাচ্ছে। ঠোঁট দু'টো কাঁপছে থর থর করে। সে আবার হারিয়ে যেতে চাইছে তার আগের জীবনে। শ্বেত পাথরের থালায় অভিশাপকে অগ্রাহ্য করে। সেই ফেলে আসা বিয়ের রাত। শুভ দৃষ্টির বহু আকাঙ্খিত পবিত্র লগ্নে মনীশের সঙ্গে তার দৃষ্টি বিনিময়। লাজনত রক্তিম মুখ-মণ্ডল। লাল গোলাপের পাপড়ি। চারিদিক সুরভিত।

এই স্বপ্নও জলে আঁকা আল্পনার মতো ক্ষণস্থায়ী। মনীশের ওপর তার কোন আস্থা নেই। বিশ্বাসের দুর্গ ভেঙে গেছে একে একে। বিষাক্ত সাপেরা ঢুকে পড়েছে তার ঘরে। মনীশ শেষের দিকে

আদালতে ডিভোর্সের মামলা করেছিল সুনন্দা বন্ধু পরীক্ষার কথা বলেছিল। বিদেশে এই পরীক্ষা সঠিক পিতৃত্ব নির্ণয়ের স্বীকৃত পদ্ধতি। এদেশে তার সুযোগ তেমন নেই। মনীশের আইনজীবী তাতে স্বীকৃত হননি। তাতে মামলার মোড় অন্যদিকে নেতে পারে—এই আশংকায়।

আত্মজের সঠিক সামাজিক পরিচয় অস্বীকার করার মধ্যে কোন পৌরুষের দাম্ভিকতা নেই। তবু পিতৃত্বকে অস্বীকার করার একটা পাগলা নেশা মনীশকে যেন পেয়ে বসেছিল। সুনন্দা তা জানে। সুহাস মিত্র এই মিথ্যে সন্দেহের বিন্দুমাত্র মূল্য দিতে নারাজ। সে সুনন্দাকে হয়তো সত্যি সত্যিই ভালবাসে। কিন্তু মনীশের এই হঠাৎ চলে যাওয়ায় সুহাস বিমূঢ়। হতবাক্। মনীশ কেন আত্মহত্যা করলো? কারণ অস্পষ্ট। সুইসাইড নোটে সে তার মৃত্যুর জন্যে কাউকে দায়ী করেনি। দেখলে কিছুই বোঝে না। সে কেবল বাবার মৃত শরীরে মুখটা দেখে ভয় পেয়েছিল। অনেকগুলো ঘুমের বড়ি খেয়ে মনীশ নিজেকে সরিয়ে নিলো এই জগৎ থেকে হয়তো বা সুনন্দার ওপর অভিমান করে। একরাশ জমাট কান্না সুনন্দার বুকের মধ্যে দানা বেঁধেছিল। ক্রমে তা চোখের কোণে পানা বাঁধলো ঠিক এই মুহূর্তে মনীশের ছবিটা তার সামনে খুবই অস্পষ্ট যেমন যেন ঝাপসা সুহাস তার অত্যন্ত কাছাকাছি হৃদয়ের পাশাপাশি। তার শরীরের উত্তাপ অনুভব করছে সুনন্দা। ডুকরে কেঁদে ওঠে সে। সুনন্দা মনীশের ভাঙা ঘর কারুর হতে পারবে না কক্ষনো না। কিন্তু মনীশ বেঁচে নেই

সাহিত্য মনস্ক একালের পাঠকের কাছে
একটি প্রিয় ত্রৈমাসিক—

এবং মুশায়েরা

সম্পাদক : সুবল সামন্ত

৩৮এ ১ নবীনচন্দ্র দাস রোড : কলকাতা—৭০০০৯০

আপনার প্রিয় লেখা পাঠান [] বিজ্ঞাপন দিন

সুভাষিণীর পদত্যাগ

বিনোদ মণ্ডল

'সুভাষিণী পদত্যাগ করবে।'

কথাটা শুনে হৃষিকেশ হাসে।

তুমি দেখে নিও, ঠাকুরপো, তোমাদের বৌদি পদত্যাগ করবে যে কোনো দিন।

হৃষিকেশের কাছে এ এক ঝামেলা। যাকে বলে ছুঁচো গেলার দশা। নতুন পঞ্চায়েত আইনে মহিলাদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। তার ফলে রাজ্যের বহু মেয়ে, বউ পঞ্চায়েতের কাজে যুক্ত হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা ভোটে দাঁড়িয়েছে। কোথাও শ্বশুরের সীটে, কোথাও স্বামীর সীটে সে সব রাজনৈতিক দলের মহিলা সেল কর্মিবর্গ— তাদের সুবিধে হয়েছে বেশি। সে দিক থেকে সুভাষিণীর পদত্যাগের কোনো প্রশ্ন থাকে কথা নয়।

তবু সুভাষিণী পদত্যাগ করবে। যে কোনো দিন

• • •

সুভাষিণীর দাদার বাড়ির ইতিহাস দারিদ্র্যের বর্ণাঢ্যতা। বাবার মেয়ে সবল করেক কাঠা জমি বিক্রির টিকিটে মনোরঞ্জপুরের পঞ্চানন তাকে বিয়ে করেছে। ছেলেটা ভালোই এমনিতে ধীর-স্থির, নম্র-ভদ্র। পেশল শরীর। প্রতি মঙ্গল আর শুক্রবার বাজারে পঞ্চানন তার বন্ধু ভাগুর সেলুনে বসে দাড়ি কাটে। তার চাপ-দাড়ি। ফলে কখনো মাত্র পঞ্চাশ পয়সা, কখনো আবার টিকটে বিড়ি লুঙ্গির ট্যাঁক থেকে বের করে, দক্ষিণা দেয়। তবে আজকাল তার মন ভালো নেই। বউ অর্থাৎ সুভাষিণী যেন বড় বেশি পর পর হয়ে যাচ্ছে। মনোরঞ্জপুরের পঞ্চায়েত তার স্ত্রী সুভাষিণী। প্রথম প্রথম পঞ্চাননের দারুণ লাগত। এখন বড় বেশী ছোট মনে হয় নিজেকে। যখন তখন বউ-এর এক কথা—আমার একটা মিটিং আছে, যেতে হচ্ছে। তুমি খেয়ে নেবে। এ আর একদম ভালো লাগে না পঞ্চাননের। একদম না।

• • •

ভোটের আগে পঞ্চায়েত সদস্য কানাই আর তার দলের রঘুবাবু ভাদুর 'মডার্ণ সেলুনে'র বেঞ্চে বসেই পঞ্চাননকে প্রথম ইঙ্গিত দিয়েছিল।

—'পঞ্চু শোন্ বাবা'—রঘুবাবু বলেছিল।

—কাকা।

হ্যাঁরে, ভোটের ব্যাপারে কি ভাবছিস্?

লজ্জায় পড়ে যায় পঞ্চানন। বরাবর সে মিছিলে আছে, মিটিং-এ আছে। ঘরে শুধু খবরটা দিলে হয়। সে থাকে। হরতাল—ব্যস্! কাজ বন্ধ করে জালছড়িটা নিয়ে ঘরে জাল বুনতে বসে যায়। মিছিলের গুরুগম্ভীর স্লোগান না বুঝতে পারলে স্লোগানে সে ক্ষীণ কণ্ঠে সাড়া দেয়—কখনো দেয় না। সে সোজা সাপ্টা যেভাবে স্বজন পর চিনেছে—সেভাবেই মেশে এদের সঙ্গে। সমর্থন করে। তার মধ্যে আবার তার সঙ্গে পরামর্শ! পঞ্চাননের বুকটা ভরে যায়—আড়ষ্টতা কাটিয়ে বলে—

—ওসব কথা আমি কিছু বুঝিনি। সে তোমার বৌমা জানে।

সেই বৌমা! সুভাষিণী, বন্তরের ভিটেয় এসেই ওদের সাতায় নাম লিখিয়েছিল সাক্ষরতার মাষ্টারনী হিসেবে। টুয়েল্‌ভ পাশ। কলেজে ভর্তি ও হয়েছিল। পরীক্ষাটায় আর বসা হল কই? প্রথমে এবাড়ি ওবাড়ি টুকটাক পড়াতে যাওয়া—পরে তাদের সবাইকে নিজের ঘরে ডেকে বসায়। পড়ুয়ারা খুব পছন্দ করে সুভাষিণীকে।

ভীষণ সাদাসিধে—পাথর কালো—প্রতিমায় গড়ন সুভাষিণী। সে যখন এবাড়িতে আসে—তখন পঞ্চাননদের চারটে কুঁড়ে—চার ভাইয়ের। পঞ্চানন কাপড় বুনে—জনমজুরি খেটে যা পায়—তাতে হেসে খেলে কেটে যাওয়ার কথা। যেতও। তাছাড়া এদের তো চাহিদার অন্ত হয় না। কলে সুখেই ছিল। বাবা-মা হারা পঞ্চাননের চার ভাই। ও সেজো। ১ছোট ভাই তখনো বিয়ে করেনি। ফলে ছোট'র কুঁড়েতেই পড়ুয়ারা আসর বসাতো। তাদের গান—আবৃত্তি, খবরের কাগজ পড়ার তালিম চলতো নিয়মিত।

পঞ্চানন মুখোমুখি নিজের কুঁড়ের মুখে তালপাতার একটা ছেঁড়া চাটাইতে বসে জাল বুনতো। আর তার বউ-এর পড়ানো শুনতো। কখনো কখনো চোখাচোখি হত। ভালোই লাগতো—তার বেশ ভালোই লাগত—যখন পাড়ার ফাংশানে—যে পাড়ার সালিশীতে

সুভাষিণীর ডাক পড়ত। সবল এই ছেলেটা দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে বলতো—

—আর আমি তোমার সঙ্গে কোথাও যাবো না।

—কেন?

—আমার লজ্জা করে।

সুভাষিণী কুঁড়ের এক পাল্লা দরজাটা পা দিয়ে ঠেলে দিত। কচি পায়ের আঘাতে ক্যাচ ক্যাচ করতে করতে বন্ধ হয়ে যেত দরজাটা। আর সুভাষিণী স্বামির গেঞ্জির ফাঁকে চুমু খেয়ে বলতো—

—বারে, রাতে-বেরাতে আমি তাহলে কিরবো কি করে? একা একা! তুমি আমার সঙ্গে থাকবে—সব সময়।

পঞ্চানন নিরুত্তর।

ধীরে ধীরে সুভাষিণীর চোখে চোখ রেখে সে বলতো—আচ্ছা!

সেই পঞ্চানন ভোটের মুখে সন্ধ্যায় বাড়ি যেতে যেতে এক্কোড় ওক্কোড় হয়ে ভাবে রঘু কাকা কেন আজ তার কাছে মতামত জানতে চাইল? তবে কি কানাই আর ভোটে দাঁড়াতে পারে না? কেন?

• • •

কথাটা খোলসা করে দিল তার বউ। সুভাষিণী। নতুন আইনে—যশোরাজপুর বুলে সব পার্টিকেই মহিলা প্রার্থী দিতে হবে গো। সারা রাজ্য জানে। গ্রামে গ্রামে আলোচনা হচ্ছে—তুমি জানো না? পুরুষ বটে তুমি। হ্যারিকেনের ধমটা কমাতে কমাতে পঞ্চানন তার বউ-এর উপর কপট রাগ দেখিয়ে নিজের অজ্ঞতাকে ঢাকতে চায়—বাদ দাও তো ওসব, বাদ দাও। যত বাজে চর্চা!

একটু পরেই পঞ্চাননের নাক ডাকা শুরু হয়। একটা একঘেঁয়ে ঘ্যাঙর্ ঘ্যাঙ আওয়াজের সাথে সাথে সেদিনের দুপুরের ঘটনাটা জট পাকাতে শুরু করে সুভাষিণীর মধ্যে। তার মনে—তার মাথায়।

তাদের সাক্ষরতা কেন্দ্রের নবসাক্ষর বেঁচুর গায়ে বসন্ত বেরিয়েছে। তাকে দেখতে গিয়েছিল সুভাষিণী। পথে বটতলায় রঘুবাবু বসে বসে ক্লাবের কয়েকটা ছেলের সাথে কি নিয়ে তর্ক করছিল। ওকে দেখে বলে:

—বৌমা, একটু কথা ছিল যে—

সুভাষিণী এখন আর সেভাবে মাথায় কাপড় দিয়ে গ্রামে ঘোরাফেরা

করে না। তাই সাক্ষরতা কেন্দ্রের সুবাদে এ বাড়ী ঘুরে যায়। তবু মাথার শাড়ির আঁচলটা খোঁপার উপর টেনে দিয়ে বলে—

—কি কথা, কাকা?

সাধারণ দু'চার কথার ভনিতা শেষ করে রঘুবাবু বলে—

—তোমাকে যে এবার ভোটে দাঁড়াতে হবে মা?

—আমি! না—তা হয় কাকা!

—ছিঃ মা! না করলে হবে না। পাঁচজনের সঙ্গে আলোচনা করে এটা ঠিক হয়েছে। তুমি রাজি হলে আমরা তোমার স্বামীর সঙ্গে কথা বলবো।

সুভাষিণী পড়ে অবৈ জলে। তার সাক্ষরতা কেন্দ্রের কি হবে? আর তার পোবেচারা স্বামীর? অত সময় সে কোথায় পাবে? না না তা হয় না। এখন সবাই এগিয়ে দেবে। বলবে—বৌমা, আমরা পিছনে আছি। ক্লাবের ছেলেরা বলবে—বৌদি—হিপ্ হিপ্ হুরে। ক্লাবে সভা হবে—সুভাষিণী সাউ—জিন্দাবাদ—না কি মজা! কিন্তু যখন রাস্তা নষ্ট হবে—ফসলের ক্ষতি হবে—তখন সে কি করবে? সবাই তো গ্রাম প্রধানের নামে। আর ভাবতে পারে না—সুভাষিণী। ভাবনার প্রকৃতিই হোলো—বিচিত্র। তাই সে যখন দেওয়ালের দিকে পাশ ফেরে—তখন তার মনে হয়—সে যেন চোরাবে বসে আছে। চারদিকে লাল আবির মাখা মুখগুলো—তাকে ঘিরে জয়ের আনন্দে মশগুল। পঞ্চানন একটা স্বেচ্ছাসেবক ব্যাজ বুকে এঁটে ঘুরছে। মন্দ না। এ পথ মন্দ না। কত মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হবে। তার সই ছাড়া বীজ ধান অনুদান পাবে না চাষীরা। সহরে পড়তে গেলে তাকেই তো সার্টিফিকেট দিতে হবে। ছেলে বুড়ো সবাই তাকে 'পঞ্চায়েত' বলবে। সে দাঁড়াবে। ভোটে দাঁড়াবে সে। রঘু কাকা তাকে বলেছে—এ নাকি তার অধিকার!

• • •

পঞ্চাননের টি. বি। ডাক্তার কোনো কাজ করতে মানা করেছে। বাস্তবিক সে পারেও না। মাস ছয়েকের মধ্যে তার শরীরটা প্যাকাটি হয়ে গেছে। ভালো খাওয়া-দাওয়ার সুযোগ নেই। সুভাষিণী চালের ব্যবসা করে। বাজার থেকে অথবা লোকের বাড়ি থেকে ধান কিনে আনে। তাসে সেদ্ধ করে শুকায়। সেই চাল বিক্রি করে বাজারে। নিজে মাথায় করে বয়ে নিয়ে যায়। সংসারের

আনাজপাতি-মশলা কেনা কাটা আছেই তার ওপর বাগীর দুধ ও পথ্য। ঘরে ঘরে এই বান থেকে চাল বানিয়ে বিক্রি করার ব্যবসা। তাদের সঙ্গে সুভাষিণী পেরে ওঠে না। কারণ তার আবার নিত্যনতুন মিছিল মিটিং লেগে থাকে। পঞ্চায়েত-এর মহিলা কমিটি, দলের গ্রাম কমিটি, অফিস স্টাফ ছাড়াও সপ্তাহে একদিন সাক্ষরতার মিটিং। আবার পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে প্রয়োজনীয় দরবার। ভোটের আগে অনেকেই তাকে আশ্বাস দিয়েছিল—তোমার কোন চিন্তা নেই। আমরা তো আছি। তারা এখন অনেকেই বেপাত্তা। নিজের চরকায় তেল দিতে ব্যস্ত। দু'একজন ঠাকুরপো গোছের ছোকরার সাহায্য ছাড়া কেউ তার পাশে মানসিক আশ্রয় নিয়ে আসে না। মাজে পোড়া খেজুর গাছের মতো কঠিন এখন এক পদার্থে পরিণত হয়েছে সে, তাকে সবতেই হবে।

• • •

আজকাল সর্বস্তরের সভায় পঞ্চাননের সঙ্গে যাওয়া যায় না এখন কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা থাকে সেখানে পঞ্চাননকে রাখা চলে না। অসুস্থ পঞ্চাননের নানা লোকের ফুঁকপাশ কান ভারি করে সাংসদের কেমন বর্ষাতি মেঘের মতো গোঁ মেরে বসে থাকে। কেউ কোনো সমস্যা নিয়ে পঞ্চায়েতের সদস্যে কথা বলতে এলে—সাংসদের-ক্ষেপে তুলে ওঠে তাদের স্বামী-স্ত্রীর সংসারে আগেও দারিদ্র্য ছিল এখনও আছে। কিন্তু সে সুখ আর নেই।

একদিন রাত সাড়ে আটটায় সুভাষিণী বাড়ি ফিরতে গিয়ে দেখে, অন্ধকারে বটতলায়—পঞ্চাননের সঙ্গে তার সমবয়সী কয়েকজন বন্ধুর জটলা। হৃষিকেশের সাইকেল থেকে নেমে পড়ে সুভাষিণী। তাকে বলে—তুমি চলে যাও। আমি এটুকু একাই যেতে পারবো কান পাতে অন্ধকারে—

ছাড়া—পার্টি ছাড়া—নষ্টকে.....

—দেখবি, ঘরের কাজকর্মে ঠিক মন দেবে—

—আজে-বাজে ছেলের সাথে মেলা-মেশা বন্ধ হবে—

—আজ কোথায় গেছে বলনি?

—বি ডি. ও. অফিস। মিটিং আছে—

—আরে বি. ডি. ও অফিস না ছাই! আমি তো দেখলাম হৃষিকেশের সঙ্গে সিনেমা হলের সামনে।

বিরক্তিতে মন ভরে ওঠে পঞ্চাননের। ঠিক করে, আজ সে যা হোক একটা ব্যবস্থা করবে। এভাবে আর চলতে দেওয়া যায় না। কি ভেবেছে কি? সাপের পাঁচ পা দেখেছে? রাত-বিরেতে যার তার সঙ্গে মিটিং! টলতে টলতে ঘরে ফেরে পঞ্চানন। দেখে, সুভাষিণী—তার বৌ, সারা গাঁয়ের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী, দুটো থালায় মুড়ি বের করে ল্যাম্পের আলোয় কি একটা রসিদ বই ধরে—টাকার হিসেব কষছে।

পঞ্চাননকে দেখে সুভাষিণী জিজ্ঞেস করে—

—কোথায় ছিলে, এতক্ষণ?

—কেন, পঞ্চায়েতকে জবাবদিহি করতে হবে?

সুভাষিণী রাগে না। এমনিতে তার মানুষটা বড় সরল। গ্রামের পাঁচজনে পাঁচকথা যে যা তাকে বোঝায়—তাই বোঝে। কান ভারি করে।

চুপচাপ থালাটা সামনের দিকে এগিয়ে দেয় সুভাষিণী—খেয়ে নাও।

—শুধু মুড়ি?

একটা ঠোঙা থেকে ঠাণ্ডা পকুড়ি বের করে স্বামীর থালায় দু'মুঠো দিয়ে দেয় সুভাষিণী ঠক্ ঠক্ শব্দে বোঝা যায় সেগুলো কখন শক্ত হয়ে গেছে।

নীরবে মুড়িগুলো সাবাড় করে পঞ্চানন। জল ঢেলে। তারপর ঘটি উপুড় করে জল খেয়ে বলে—

—কি ঠিক করলে?

—কিসের?

—তোমাকে না বললাম, ও সব পঞ্চায়েত ছেড়ে দাও—

—ভাবছি।

—আরো কত ভাববে? আমি না মরা পর্যন্ত……

থালা দুটো গুছিয়ে ঘাটের পথে পা বাড়ায় সুভাষিণী। যেতে যেতে বলে—তুমি কেন মরবে? তার আগেই আমি—

হুঁ! বলে ব্যঙ্গের—বিরক্তির হাসি ছড়িয়ে সটান ছেঁড়া মাদুরটায় গড়িয়ে পড়ে পঞ্চানন। তখনি ধক্ করে তার মনে পড়ে যায়—বটতলার সেই সব কথা!

সুতোর মলাটি টাঙিয়ে মেঝেতে মাদুরের চারিদিক ভালো করে গুঁজে দেয় সুভাষিণী। তারপর সাদা কাগজ বের করে নিজের সঙ্গে

নিজের চুল করতে করতে নিজে চলে তার পদত্যাগ পত্র ফেলে ফেলে সুভাষিণী। নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে পঞ্চানন। পাশে বসে সুভাষিণী কাঁদছে। ও শেষবার কেঁদেছিল—প্রথম এ বাড়িতে আসার সময়। তখন পঞ্চাননের দুটো পেশল হাত ভার কাঁধে। সে হাতে ছিল আস্থা-অন্বয়-ভরসা। আজ তা অক্টোপাশের মতো। তার সংগঠন—তার মনোরাজপুর গ্রাম……। হেরে গেল সুভাষিণী। ভোটে জিতেছিল। নিজের বিবেকের সঙ্গে আজ সে পেরে উঠলো না।

• • •

বিশ্বত সূত্রের খবর, সুভাষিণীর সেই পদত্যাগ পত্র আর জমা দেওয়া হয়ে ওঠেনি। হৃষিকেশ পরদিন ভোরে হাজির হয়েছিল। জোর করে পদত্যাগের কাগজটা দু'টুকরো করে দিয়েছিল। আর বলেছিল—

—বৌদি, যাবেনা মিটিং-এ ?

শাড়িটা দুপায়ের ফাঁকে ভালো করে গুটিয়ে সাইকেলের সামনে বসে পড়ে সুভাষিণী। বলে 'দাঁড়াও, আগে ভালো করে বসি। টাল-মাটাল হলেই পড়ে যাবার সম্ভাবনা'……

মোরাম বিছানো রাস্তায় সাইকেলের সামনে বসা যায় না। হাড়ের দাঁতের মতো কাঁকরগুলো মাথা উঁচিয়ে আছে সেখানে সেখানে। একটা বাঁড় রাস্তার উপর আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে জাবর কাটছিল।

সুভাষিণী বললে—বেল বাও।

—দরকার নেই।

—কেন ?

—আমরা ঠিক পেরিয়ে চলে যাব।

যদি সুস্থ সংস্কৃতি ভালবাসেন—
যদি সৎ সাহিত্যে বিশ্বাসী হন
তাহলে—
'সৃজন'কে ভালবাসুন। 'সৃজন' পড়ুন।

প্রগতি সাহিত্যের উজ্জ্বল
দৃষ্টান্ত হোক 'সৃজন' ঃ

শ্রীগোপীবল্লভ ভুক্তা
সহকারী শিক্ষক
খুকুড়দহ আই, সি, এম, এম, উচ্চ বিদ্যালয়
খুকুড়দহ ঃ মেদিনীপুর

সুস্থ জীবন ভাবনার
মুখপত্র 'সৃজন' এর
প্রতি অভিনন্দন ঃ

শ্রীনিতাইচন্দ্র পাণিগ্রাহী
সহকারী শিক্ষক
খুকুড়দহ আই, সি, এম, এম, উচ্চ বিদ্যালয়
খুকুড়দহ ঃ মেদিনীপুর

শতবর্ষের আলোকে সাম্প্রতিক বাংলা চলচ্চিত্র

অরুণাভ বেরা

১৯৯৫ সালে চলচ্চিত্র-র জন্মশতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। কারণ ১৮৯৫ সালে প্যারিসের গ্রাঁ-কাফেতে লুমিয়ের ভাইয়েরা প্রথম ছোট ফিল্ম দেখান। তৎকালীন সময়ে আমেরিকা চলচ্চিত্র বানানো ও উন্নতিসাধনের দিকে এগিয়ে যায়। ভারতবর্ষে সিনেমা এসেছে ১৮৯৬ সালে ৭ই জুলাই। ঐ বছরের শেষের দিকে কলকাতায় 'চলচ্চিত্র' এল। তারপর বিভিন্ন জায়গায়, মেলায়, তাঁবু খাটিয়ে চলচ্চিত্র দেখান হত এবং তা ছিল অবশ্যই নির্বাক ছবি। ১৯০৭ সালে কলকাতায় ম্যাডান কোম্পানি প্রথম এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেস তৈরী করে এবং স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহের উদ্বোধন হয়। ভারতে ধীরে ধীরে সিনেমা প্রসারিত হয়। বিদেশি ছবি আমদানি হত ইংলন্ড, আমেরিকা, জার্মানি, ফ্রান্স থেকে। ছবি দেখানো ও তৈরীর ব্যাপারে হীরালাল সেন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। ১৯১৩ সালে ভারতবর্ষে প্রথম কাহিনীচিত্র তৈরী হয়, নাম 'রাজা হরিশ্চন্দ্র'। এটি তৈরী করেন মহারাষ্ট্রের ধুনধিরাজ গোবিন্দ (দাদাসাহেব) ফালকে।

বাংলা সিনেমার পথ চলা শুরু ১৯১৯ সালে কলকাতায় ম্যাডান কোম্পানি ১৯১৯ সালে প্রথম বাংলা কাহিনীচিত্র তৈরী করে।—নাম 'বিল্বমঙ্গল'। দশের দশকে বাংলা ছবি তৈরী হয়েছিল একটি। পরের দশকে তৈরী হয়েছিল প্রায় শতাধিক। নির্বাক বাংলা সিনেমার সংখ্যা একশ' কুড়ি। এর মধ্যে কেবলমাত্র 'জামাইবাবু' নামক একটি ছবির 'প্রিন্ট' পাওয়া গেছে। এরপর আসে সবাক ছবি। তখনকার বেশির ভাগ ছবিই তৈরী হত পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে। নির্বাক ছবি থেকে সবাক ছবি তৈরী হওয়ার কিছুকালের মধ্যেই, সিনেমার কাহিনী সাহিত্যনির্ভর হতে শুরু করে। এর প্রধান পথপ্রদর্শক ছিলেন ডেভিড ওয়ার্ক গ্রিফিথ। সিনেমা যখন কথা বলতে শিখল—তখনই আঞ্চলিক ভাষার প্রাধান্য শুরু হয়। সবাক সিনেমার দর্শক বহুগুণ বেড়ে যায়। সিনেমা

জনগণের শিল্প ও মাধ্যমে পরিণত হয়। মিবাক ছবি থেকে সবাক ছবি ও তারও পরে রঙিন ছবির মধ্য দিয়ে সিনেমা বর্তমানে উচ্চতর প্রযুক্তির অধিকারী। যন্ত্রযুগে গতি যখন জীবন ও বাস্তবতার সঙ্গে জড়িত—চলচ্চিত্র এই বাস্তবতার দিকে এগিয়েই নিজের অবস্থানকে পাকা করে নিয়েছে:

• • •

ত্রিশের দশকে বাংলা সিনেমার সংখ্যা অন্যান্য সিনেমার মতই গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পৌঁছায়। কাহিনীচিত্রের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯৩৬ সালে বাংলা সিনেমা তৈরী হয় ১৯টি। তামিল সহ বেশ কিছু ছবিতে পৌরাণিক কাহিনী প্রাধান্য পেলেও—বাংলা ছবি ছিল স্বতন্ত্র। বাংলা সিনেমার প্রধান দর্শক অর্থাৎ বাঙালীর তৎকালীন সাহিত্যপ্রীতির জন্য, বাংলা সিনেমার কাহিনী মূলতঃ বিখ্যাত সাহিত্যিক-দের রচনাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। প্রযুক্তির দিক থেকে সিনেমা তখনকার সময়ে পিছিয়ে থাকলেও বাংলা সিনেমা অন্যান্য সিনেমার চেয়ে অগ্রণী ও স্বতন্ত্র ভূমিকায় ছিল।

গত বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে যখন কালোবাজারী ও কালো টাকার রমরমা শুরু হল তখন তার প্রভাব চলচ্চিত্রের ওপরও পড়ল। কালো টাকার ফুলে ওঠা ব্যক্তিরা চলচ্চিত্রে টাকা ঢালার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ১৯৫৫, ৬৬ ও ৬৭ সালে বাংলা ছবি তৈরী হল যথাক্রমে ৯, ৩২। যেখানে হিন্দি ছবি যথাক্রমে ৭৪, ১৫৬, ১৮১। দর্শন সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সিনেমার কাহিনীনির্ভরতা কমতে শুরু করে। বাংলা চলচ্চিত্রে বাংলা গল্পের মর্যাদার মাত্রা বেশি থাকলেও, খুব সূক্ষ্ম ভাবে বাণিজ্যিক প্রভাব ও উপকরণের দ্বারা তা প্রভাবিত হতে আরম্ভ হয়। পার্সি থিয়েটারের দ্বারা মহারাষ্ট্রের 'তামাশা' নাচ-গান হিন্দি ছবিতে আসে এবং ক্রমশঃ এই জীবন্ত সমস্ত প্রকার ছবিতেই প্রবেশ করে।

• • •

বাংলা সিনেমা, ভারতীয় সিনেমা তথা সমগ্র চলচ্চিত্রের জগতে এবং ইতিহাসে প্রথম সারির যে নাম উজ্জ্বলতর—তা হল সত্যজিৎ রায়। ১৯৫৫ সালে 'পথের-পাঁচালী' কলকাতায় প্রদর্শিত হয়। 'পথের-পাঁচালী' সিনেমার জগতে ব্যাপক পরিবর্তনের সাড়া জাগায়। যন্ত্রবিন্যাসের সূচনার প্রত্যক্ষতা এই ছবির মাধ্যমে সূচিত হয়। এই

ছবি, ছবির পরিচালক দেশ-বিদেশে ব্যাপকভাবে রিপ্রেজেন্টেড ও সমাদৃত হয়েছেন। ১৯৫৫ সালে 'পথের পাঁচালী' 'কান' চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়। 'পথের-পাঁচালী' দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। প্রচুর সংখ্যক দর্শক এই ছবির প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই ছবিটির মাধ্যমে সিনেমা শিল্পে নতুন আঙ্গিকের সূচনা ঘটে।

ভারতবর্ষের মধ্যে নতুন ধরণের, নতুন আঙ্গিকে ছবি তৈরীর ভাবনা একমাত্র বাংলা ছবিতেই প্রথম তৈরী হয়। পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক-এর অনেক ছবি তৈরী হয়। 'অপরাজিত', 'জলসাঘর', 'অপুর সংসার', 'দেবী', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'বাইশে শ্রাবণ', 'ঋত্বিকের অতিথি' সহ যেন কয়েকটি ছবি বাংলা সিনেমাকে উৎকর্ষতা দিয়েছিল। অবশ্যই এই ধরণের সিনেমার শিল্পবোধ ভালো সিনেমার উন্নত পরিবেশ গড়ে তোলে।

ঋত্বিক চলচ্চিত্র আবিষ্কার ও নতুন আঙ্গিকের চলচ্চিত্র আবিষ্কারের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল সত্যজিৎ রায়ের আবির্ভাব পর্যন্ত। এরপর ঋত্বিক ঘটক, যিনি একজন মৌলিক শিল্পভাবনায় এবং উৎকর্ষতায় ও প্রথম সারির বলিষ্ঠ পরিচালক। তাঁর 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার', 'সুবর্ণরেখা' প্রভৃতি ছবিগুলো দর্শককে অনুভূতির অন্তস্তরে নিয়ে যায়। মৃণাল সেনের 'বাইশে শ্রাবণ', বাবিন সাহার 'ভেরো নদীর পারে' নিরীক্ষণমূলক ছবির প্রকাশ। বাংলা চলচ্চিত্রের বহমানতায় নতুন তরঙ্গ দেখা যায় সত্যজিৎ-মৃণাল-ঋত্বিকের প্রায় কুড়ি বছর পরে। উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, গৌতম ঘোষ, দিলীপ রায়, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, বিপ্লব রায়চৌধুরী, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, শংকর ভট্টাচার্য, অপর্ণা সেন, সন্দীপ রায়, সৈকত ভট্টাচার্য এই সময়কার প্রতিভা। স্বদেশে স্বর্ণকমল পেয়েছেন বিপ্লব, গৌতম উৎপলেন্দু। সৈকত, বুদ্ধদেবের ছবি বিদেশে পুরস্কৃত হয়েছে। বিগত চলচ্চিত্র উৎসবে বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'চরাচর' ও তপন সিংহ-র 'হুইল-চেয়ার' স্থান পেয়েছিল। এই ছবি দু'টো একাধিক পুরস্কারও পেয়েছে। এঁরা অবশ্যই গতানুগতিকতার স্রোতের বাইরে অবস্থান করেন। অবশ্য সত্যজিতের দৃষ্টিভংগীর সঙ্গে, উপরোক্ত পরিচালকদের ছবি কিছুটা ভিন্নমুখী। যেমন উৎপলেন্দুর ছবিতে পাওয়া যায় 'স্যাটায়ারসিজম' ও জীবনমুখী মিশ্রণ। সৈকত ভট্টাচার্যের ছবির মধ্যে

উৎকেন্দ্রিক বসবোধ কখনও 'ডুয়ালিটি', 'সিমিসিজম্', সংঘাত পাওয়া যায়। বিপ্লব রায়চৌধুরীর ছবি সপ্রতিভ, কলাকৌশলে দক্ষ। তবে এঁর ছবির কাহিনী ও বক্তব্যে কিছু দোদুল্যমানতা দেখা যায়। গৌতম ঘোসের ছবিতে নতুনত্বের প্রতি টান আর 'ডকুমেনটেশনের' দিকে ঝোঁক আছে। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের ছবিতে সুগঠিত চলচ্চিত্র পাওয়া যায়। তাঁর ছবির শিল্প, ধিম, প্রতিবাদ অনস্বীকার্য। অপর্ণা সেনের '৩৬ চৌরঙ্গী লেন' ভারতীয় ধারার অপ্রাসংগিক হলেও, এই ছবির 'থ্রিল' ও নিঃসঙ্গতা আন্তর্জাতিক মানের। মাধ্যমিক দিক থেকে বলতে গেলে এই নতুন আঙ্গিকের ছবিগুলিতে সামাজিক, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যা ফুটে উঠেছে। এগুলোর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য সমষ্টিমানস, সমাজজীবনের স্বাভাবিক প্রতিফলন ও উপস্থাপনা, গঠনকাঠামোর 'স্ট্রাকচারালিজম্'। বস্তুতঃ এই জন্যই ছবিগুলি নতুন শক্তি পেয়েছে। আধুনিক সুস্থ চলচ্চিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, 'থিমেটিক মোটিভকে' আশ্রয় দেওয়া। অথচ এখনকার চলচ্চিত্রে তা পাওয়া যায় না। বাংলার সাংস্কৃতিক চলচ্চিত্রকে 'একা' দোষে দেওয়াটা কাজের কথা নয়, সমগ্র চলচ্চিত্র শিল্প [ব্যতিক্রমী চলচ্চিত্র ছাড়া] এই দোষে দুষ্ট। কর্মার্শিয়াল ফিল্মে, কি বাংলা, কি হিন্দি, সর্বত্রই অভিনয়, অ্যাটিচুড, প্রকরণ সিনেম্যাটিক রেলেভেন্স, থিমেটিক রেলেভেন্স। পরিচালকের উদ্ভাবনী ক্ষমতা এখন চলচ্চিত্রে বিরল। চিন্তা, অনুভবের গভীরতা, ছবির 'সাবনেন্স', 'ডাইমেনশন'—আমরা বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত সহ ঐ স্তরের পরিচালকদের ছবিতে পাই—তা এখন বিরল। ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক' ছবির শিল্পকর্ম প্রয়োগের উৎকর্ষতা, গতানুগতিকতার বাইরে ছোট্ট একটি গল্পের চিত্ররূপ খুব কমই পাওয়া যাবে।

বাংলা ছবিতে জীবনদায়ী ওষুধ খুঁজিয়েছেন তিনজন—সত্যজিৎ, ঋত্বিক ও মৃণাল। বাণিজ্যিক কাঠামোতে ভালো ছবি করেছেন তরুণ মজুমদার, তপন সিংহ।

বাংলা চলচ্চিত্রের শতবর্ষের অগ্রগতি সামনে রেখে কিছু সমস্যা কিছু জিজ্ঞাসায় আমরা আন্দোলিত হই। প্রায় প্রত্যেক সংবেদনশীল দর্শককেই তা স্পর্শ করে। ভারতবর্ষে চলচ্চিত্র সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম। কম পয়সায় তাৎক্ষণিক আনন্দ দিতে পারে সিনেমা। আর এই একমাত্র কারণ ও 'দুর্বলতার' সুযোগ নিয়ে, এই মাধ্যমটিকে অবশ্যই কিছু মানুষ ব্যবহার করছে কেবলমাত্র অর্থ ও মুনাফা

লাভের আশায় যে পরিচালক নিজের ভাবনা, বিশ্বাসে অবিচল থাকতে চান এবং এই গণ-মাধ্যমটির দায়বদ্ধতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, তিনি কিছুতেই তথাকথিত 'পপুলার' ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠেন না, যে ছবি সারা ভারত জুড়ে একাধিকবার দেখার মত দর্শকের অভাব নেই। সাম্প্রতিক বাংলা সিনেমার ক্ষেত্রেও ঐ কথাটি প্রযোজ্য। সমস্ত আঞ্চলিক ছবি—যেমন বাংলা ছবি এবং অবশ্যই 'সুস্থ' বাংলা ছবির কাছে সবচেয়ে বড় ও তীব্র বাধা বাণিজ্যিক ও অপভ্রংশী হিন্দি ছবির অসম প্রতিযোগিতা। বর্তমানে বাংলা ছবির নিম্নগামী রুচি ও অন্তঃসারশূন্যতায় বাণিজ্যিক অপভ্রংশী হিন্দি ছবির প্রভাব স্পষ্ট। শিল্পসিদ্ধ ছবি তৈরীর অভাব, ভাঁড়ামির অপ্রতিভা, বাণিজ্যিক ছবির তথাকথিত চমক—মৌলিক চিন্তাধারা মূলক বাংলা ছবি সহ সমস্তপ্রকার আঞ্চলিক ছবিকে বানচাল করছে। অথচ একদিন 'পথের-পাঁচালী' দেখে দর্শকরা উৎফুল্ল হয়েছিলেন, কিন্তু বর্তমানে দর্শার ডান-বাম-উপর-নীচ সবদিক থেকেই দেখা যাচ্ছে অরুচিকর, অশিক্ষিত, অমার্জিত রুচির ছোঁয়া। বিদেশে সত্যজিতের ছবিই ভারতীয় চলচ্চিত্রের পরিচায়ক ভারতীয় ছবি বলতে সত্যজিতের ছবিই বিদেশে পরিচিত অথচ সত্যজিতের ছবি 'মাস্' সিনেমার কাছে জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে ধ্রুবতারার মান। যেমন 'জেমস-বণ্ডের' কাছে তার মেনেছিল মাইকেলের 'ট্রাম্প্'। এইভাবে মৃণাল সেন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, গৌতম ঘোষরাও তার মানেন।

দর্শক অধিকাংশই নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, বা সেকাপড়া জানা মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী। অনেকেই বলেন চলচ্চিত্র শুধু মনোরঞ্জনের জন্য: এই মাধ্যমটির কাছ থেকে সামাজিক দায়বদ্ধতা, পারিপার্শ্বিক গণ্ডির কথা শ্রেণীগত অবস্থানের কথা শোনা ও দেখার আশা করা ভুল। যে গুটিকয়েক 'আর্ট ফিল্ম' আছে—সেগুলি কেবল 'এলিট্'দের জন্য। এই ধারণা আজ বদ্ধমূল। তাইতো 'পপুলার' সিনেমার দর্শকরা কোঁচড়ে মুড়ি, চিঁড়া, আলুভাজা নাড়ু নিয়ে দলে-দলে 'বেদের মেয়ে জোছনা' কিংবা যাদু মুহূর্তে-মুহূর্তে 'লাল পান বিবি' দেখতে যায়। আর টি. ভি -তে যদি মৃণাল কিংবা সত্যজিৎ অথবা 'উপকরণহীন', সত্তা আবেগ বর্জিত ছবি হয় তা'হলে অনেকেই এমনকি অনেক খাঁতেল বুদ্ধিজীবীরাও টি. ভি.র সুইচ্ অফ্ করেন। সিনেমা হলেও এইসব ছবি এলে টিকিট-বাবুরা হাই তোলেন। 'Cinema & Wine'

নামে একটি লেখায় মন্তব্য করেছিলেন—".....the Cinema is sick. Capitalism had thrown gold-dust into it's eyes. They are raking in the money by stirring the hearts of the Public with sob stories" বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক বা আধা বুর্জোয়া সংস্কৃতি ব্যবস্থা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে যে কাজগুলো কৌশলে করতে চায়, তা হল :

আঞ্চলিক সংস্কৃতি ধ্বংস, মানবিক, সামাজিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে ফেলা, অসুস্থ চেতনার জন্ম দেওয়া, মানুষকে পারস্পরিক বিরোধ ও দ্বন্দ্বে আচ্ছন্ন রাখা, নিজস্ব সংস্কৃতি,—সামাজিক, আর্থ-সামাজিক কাঠামোর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা, অন্তঃসারশূন্য, বক্তব্যহীন যৌনতা সর্বস্ব শারীরী লহমায় বুঁদ রেখে নিজের অবস্থানকে গুলিয়ে ফেলা। বস্তুতঃ সাম্প্রতিক বাংলা চলচ্চিত্রও এর বাইরে নয়। অনেকে বলেন সিনেমার জন্মের আগে থেকে যখন যৌনতা ছিল তা বর্তমান সিনেমায় দেখালে ক্ষতি কি? আসলে চলচ্চিত্র মাধ্যমকে এমন ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে যার মাধ্যমে দর্শকদের নিম্নরুচি বিলেষ দিগুণে সুড়সুড়ি ও উত্তেজনা দেওয়া হচ্ছে। যৌনতাকে অতীন্দ্রিয় বিষয় হিসেবে দেখানো হচ্ছে। বিষয়টি শুধু বাংলা সিনেমা, হিন্দি সিনেমা—এইভাবে ভাগ করলে চলবে না। সমগ্র চলচ্চিত্র শিল্প আজ বিপন্ন। তবুও 'মাস্' সিনেমার পপুলারিটি বেড়েই চলেছে এবং আরও বাড়বে। কারণ যে ভাবে হোক মুনাফা অর্জনই এখানে শেষ কথা। এর জন্য পরিচালক, প্রযোজকরা যতরকম উপাদান প্রয়োজন তা আরও বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করছেন। একজন পরিচালকের ক্ষেত্রে পপুলার সিনেমার আকর্ষণ অনেক, অপরদিকে নিজের সুস্থ ভাবনা-চিন্তা নিয়ে ছবি তৈরীর বাধা প্রচুর। সস্তা বাণিজ্যিক ফিল্মে টাকা ঢালার লোকের অভাব নেই; কিন্তু গতানুগতিকতার বাইরে ছবি তৈরীর অন্যতম বাধা—টাকার অভাব। কারণ এই ধরণের ছবি তৈরীর ক্ষেত্রে টাকা দিতে কেউ সহজে এগিয়ে আসে না; কেউবা রাজি হলেও মাঝপথে টাকা বন্ধ করে দেন। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমানে ভালো, সুস্থ ফিল্ম তৈরীর জন্য অর্থানুকূল্য ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা, দিচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভালো ল্যাবরেটরীও (রূপায়ণ) তৈরী করেছেন। বিখ্যাত পরিচালকদের বেশ কিছু ছবি এখানে তৈরী হয়েছে।

যন্ত্রতান্ত্রিক ব্যবস্থার Mechanical reproduction of art হল, এই চলচ্চিত্র মাধ্যম। সব মিথ্যাকে, অসাড়ত্বকে, আদি অথচ বেসিক কিছু জিনিষকে 'মিথ্যা'র চকচকে মোড়কে মুড়ে দর্শকদের সামনে হাজির করা ও গেলানোই শেষ কথা। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিজের স্বার্থেই মাধ্যমকে ব্যবহার করে। সমস্ত মাধ্যমে এই প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। যারই জন্ম সম্প্রতি সাম্প্রতিক অপভ্রংশী চলচ্চিত্র। সাম্প্রতিক বাংলা চলচ্চিত্রও এর বাইরে নয়।

সাম্প্রতিক বাংলা চলচ্চিত্র নকল করে চলেছে বোম্বে কিম্বা ইতালীকে। বলিউড নকল করছে হলিউডকে। মৌলিকতার অন্ততঃ ন্যূনতম মৌলিকতার অভাব আজ প্রকট। সমগ্র চলচ্চিত্র শিল্প বর্তমানে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত কিছু লা-দানির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। অথচ বাংলাতেই হলিউড, বলিউডের দাবদাহ বাইরে নতুন তরঙ্গ (New Wave) এসেছিল। কিন্তু একশ্রেণীর প্রযোজক, পরিবেশক, পরিচালক সব কিছুকে 'ধুতো আঙুল' দেখিয়ে নতুন আঙ্গিকের ওপর ভস্ম ঢেলে দিয়েছেন। আসলে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেও আস্তে আস্তে ব্যক্তি মালিকানার আধিপত্য ঘটার সঙ্গে সঙ্গে ঝকঝকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফসলই হল এই সস্তা আবেগ, লঘু রুচি। আরো, আরো অর্থ উপার্জনের আশায় ব্যবহার করা হচ্ছে এই গণ মাধ্যমকে। বাংলা চলচ্চিত্রও এদের কবলে। যেখানে গোটা দেশে চলচ্চিত্রের অধঃগামিতা ও অপভ্রংশ—সুতরাং বাংলা চলচ্চিত্রে এর ছায়া এবং প্রভাব পড়া খুবই স্বাভাবিক বিষয়। এখনতো হিন্দির পাশাপাশি বাংলা চলচ্চিত্রেও এমন সব প্রযোজক-পরিচালকরা আসছেন যাঁরা 'চলচ্চিত্র' মাধ্যমটি কি, কেন, তাই জানেন না। এই শিল্পটিকে ব্যণিজ্যের হাতিয়ার করতে তারা সামান্য প্রকার নৈতিকতাকেও বিসর্জন দিয়েছেন। বিস্মিত হতে হয়, পরিচালকরা তথাকথিত উঠতি নায়িকাদের ছবির প্রযোজকদের শয্যা-সঙ্গিনী হিসেবেও 'সাপ্লাই' দিচ্ছেন। এই সব ব্যাপার বোম্বেতে অনেক আগেই শুরু হয়েছিল—এখন টালিগঞ্জেও হচ্ছে। এই বিষয়ে বেশ কিছু পুরনো শিল্পী আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। ক্ষুব্ধও হয়েছেন। বর্তমানের বেশ কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রী এর বিরুদ্ধে সোচ্চারও হয়েছেন।

কবিতা লিখলেই 'কবি' হওয়া যায় না। কোন একজনকে কবি তখনই বলা হয়, যার নিজস্বতা থাকে, ন্যূনতম হলেও মৌলিকতা

থাকে, নিজের 'স্টাইলাইজেশন' থাকে। ধরে 'দিল এঁটে', সমাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকে কবিতা লিখলেই 'কবিতা-লেখা' হয় না। ঐ কথা একজন চলচ্চিত্র নির্মাতার ক্ষেত্রেও একশ' ভাগ সত্য বলা চলে। আর এই নিজস্ব শৈলিতকা বা 'ধারা'র অভাব সাম্প্রতিক বাংলা চলচ্চিত্র সহ সমগ্র চলচ্চিত্রে। চলচ্চিত্র নির্মাতাদের অন্তর্দৃষ্টির অভাব এবং কেবলমাত্র তথাকথিত 'পপুলারিটি' ফেটিশিজমের ওপরই ভিত্তি করা চলচ্চিত্রের কাহিনীবিন্যাস, সামাজিক অবস্থানের প্রবণতা সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের পক্ষে যথেষ্টরও বেশি। এর বিষয় সংগীত টি. ভি এবং অপভ্রংশী তথাকথিত কিছু 'সাহিত্য'।

সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন,—"বাংলা ছবির সবচেয়ে বড় দুর্বলতার জায়গা হল চিত্রনাট্য·····শিল্পের একটা গঠনগত দিক থাকে, তার উপস্থাপনা যে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বেঁধে রাখা চাই, ভারতীয় শিল্পধারায় এই বাঁধাবাঁধি নিয়মে ঠিক রপ্ত হয়ে ওঠে নি।" একজন সংবেদনশীল দর্শক এই উপস্থিতিকে অবশ্যই সমর্থন করবেন। বর্তমানে সৃজনধর্মী প্রবণতা কমতে কমতে শেষ হয়ে এসেছে—মুষ্টিমেয় কিছু ক্ষেত্র ছাড়া।

এছাড়া সম্প্রতিকালে সিনেমা শিল্পের স্বভাবগত পরিবর্তন ঘটেছে দ্রুত। টালিগঞ্জের স্টুডিওগুলো থেকে প্রতি বছর 'সিনেমা' নামক কতগুলো 'জলছবি' বেরোয় এবং তৈরী হয় 'কেঁচো খুঁড়তে কেউটে' মার্কা ছবি। তথাকথিত মাচে, গানে, অ্যাকশনে, উত্তেজনায় 'হেভিডোজ' সব ছবি ডজন ডজন রিলিজ হচ্ছে। ফুটফোড় পরিচালক, প্রযোজকরা ছবি তৈরী করছেন। হালফিলের ছবিতে কি থাকে? হালফিলের ছবিতে টালিগঞ্জের নায়করা বিস্তর মারপিট করছেন, উদ্ভট প্রেম, কাঁধ ঝাঁকুনি, ঘুষোর ধমন শিষ্টের পালন, সেক্স-ভায়োলেন্স, অবাধ যৌনতা, চোখে লিটার-লিটার মিসাবিন ঢালা নায়িকার ফুলো-ফুলো চোখের জল, ধর্ষণ, মাস্তানি, মারপিট, নানারকম ডিগবাজি, মেকি সেন্টপ্রেম, ধর্মীয় আবেগ সমাজের তথাকথিত অন্যায় দুর্নীতি ধোয়ানোর নামে নির্লজ্জ কাহিনীবিন্যাস, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নামে অবাধ মারপিট, চটকদার সংলাপ—এই সাম্প্রতিক বাংলা সিনেমার উপকরণ তথা পাঁচফোড়ন। এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে, যে বাংলা ছবির প্যানপ্যানানি কাটাতে হলে, নায়িকাকে পাশার জন্য নায়ককে ব্যাপক নাচ-গান করতে হবে, মারপিট করতে হবে। এমনকি

প্রেম করার সময়ে কোন ঝালাপালা করা গান ও উল্টোপাল্টা নাচ না থাকলে, ভিলেন কিংবা মাস্তানদের হাতে নায়িকার শাড়ি, স্কার্ট একটু-আধটু [কখনও বা বেশি] ছেঁড়া-টেঁড়া না হলে, তারপর মাস্তানদের সঙ্গে নায়কের মেরুদণ্ড রক্তাক্ত মারপিট না হলে, অকচিকর নুড়নুড়ি দেওয়া দৃশ্য না থাকলে বাংলা সিনেমার একঘেঁয়েমি বা চিমেতালের কিমুনি কাটবে না। নারী প্রগতির নামে মাঝে-মাঝে কেজেষ্ট্ কিমস পরিহিতার আকচার মারপিট, প্রতিহিংসা বা প্রতি-শোধের নামে ভায়োলেন্সের চালাও কারবার কিংবা শাশুড়ি-বউয়ের চটকদার ডাইঅ্যালগ্ (Dialogue) বর্তমানে সিনেমার অঙ্গ। কাহিনীর অসংলগ্নতা তো আছেই। সাম্প্রতিক বাংলা সিনেমা ছাড়াও, হিন্দি ছবিতেও এ সব উপকরণ পাওয়া যায়। হিন্দি ফিল্মেরই প্রতিচ্ছবি বাংলা ফিল্মে পড়েছে। যদিও ফটোগ্রাফি, সেন্সরাল এফেক্ট, টেকনিক, উপস্থাপনার দিক থেকে বাংলা ছবি হিন্দির থেকে পিছিয়ে আছে। তবে ভিত্তিভূমি একই। বোম্বে, টালিগঞ্জ চলচ্চিত্রের আঙ্গিকের দিক থেকে হয় একসূত্রে গাঁথা। ছবি দেখার জন্য প্রেক্ষাগৃহে না গেলেও চলবে, কারণ চলচ্চিত্রের বিষয় সাপ্লাই টি ভি.-র কৃপায় ও দালালিতে সস্তা ফিল্ম বাড়িতেই সবাই একসাথে হামলে খাচ্ছেন।

টালিগঞ্জের স্টুডিওগুলো এক ফর্মুলার পুনরাবৃত্তিতে চলছে—যেমন চলছে সমগ্র ভারতে ১০০ বছরের এই মাধ্যমটি। গতানুগতিকতার বাইরে এসেও, 'আর্ট ফিল্ম' নামক গম্ভীর শব্দটির কাঠামোর বাইরে থেকেও, 'বাণিজ্য' শব্দটি মাথায় রেখেও সুস্থ ফিল্ম তৈরী করা যায়—এমন উদাহরণও আছে। তবুও দর্শকদের 'সিনিসিজম' বানিয়ে একই ফর্মুলা 'গেলানো' হচ্ছে। না হলে ছবি 'হিট' করবে না যে!

প্রতিভাবান অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ যারা এই শিল্পটিকে সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে নতুন মাত্রা দিতে পারেন তাদের সংখ্যাও দ্রুত কমে যাচ্ছে। ১৯৮৭ থেকে ৯১ এই ২৯ বছরে টালিগঞ্জের মাত্র তিনজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নির্বাচিত হয়েছেন। এঁরা হলেন—উত্তমকুমার, উৎপল দত্ত (ভুবন সোম), অরুণ মুখোপাধ্যায় (পরশুরাম), মিঠুন চক্রবর্তী (মৃগয়া, তাহাদের কথা)। যদিও মিঠুন টলিউডের লোক নন। শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র, অভিনেতা অভিনেতা, অভিনেত্রীর পুরস্কার চালু হওয়ার

আগে টালিগঞ্জে যথেষ্ট উত্তমানের অভিনয় পাওয়া গেছে। যেমন—উত্তমকুমার (নায়ক), বসন্ত চট্টোপাধ্যায় (প্রতিদ্বন্দ্বী), শতাব্দী রায় (আতঙ্ক), সুপ্রিয়া দেবী (মেঘে ঢাকা তারা) ইত্যাদি।

উপরন্তু বাংলা সিনেমার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের 'মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার' ঝোঁকও আছে। যেমন—বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়কে অনেক আগেই 'ভারতরত্ন' উপাধি দেওয়া, ভারত সরকারের উচিত ছিল। ফ্রান্স থেকে সত্যজিৎ রায় যখন সর্বোচ্চ পুরস্কার পেলেন—তখন হঠাৎ ভারত সরকার অনুবীক্ষণ যন্ত্রে আবিষ্কার করলেন বিশ্ববন্দিত এই চলচ্চিত্রকারকে। অনেক বিলম্বে 'ভারত-রত্ন' উপাধি সত্যজিৎ রায়কে দেওয়া হল। অনেক দেরিতে ভারত-সরকার বুঝলেন যে 'সত্যজিৎ রায়' নামে কেউ একজন এ দেশে, বিশেষত বাংলায় আছেন! সুস্থ ও ভালো চলচ্চিত্রের প্রতি সরকারের (ভারত সরকার) আগ্রহ ও ঐকান্তিক ইচ্ছের (!) উদাহরণ—এর থেকে ভালো আর কিছু আছে কি?

তবে আশার কথা, দীর্ঘদিন পর ঋতুপর্ণ ঘোষের ছবি 'উনিশে এপ্রিল' ১৯৯৯ সালের সেরা কাহিনীচিত্র নির্বাচিত হয়েছে। 'স্বর্ণকমল' জয়ী এই ছবির তরুণ পরিচালক গতানুগতিকতার বাইরে ছবি করেন। 'উনিশে এপ্রিল' ছবিটির, ১৯৯৮ সালের ৪ঠা জুন আলিপুরে শুটিং শুরু হয়। ১ ঘন্টা ১০ মিনিটের ছবিটিতে আউটডোর শুটিং নেই। হস্টেল জীবনে নিঃসঙ্গ মেয়ে অদিতি (দেবশ্রী রায়) তার মৃত বাবার স্মৃতি আঁকড়ে বেঁচে আছে। মেয়েটির মা (অপর্ণা সেন) ব্যস্ত নৃত্যশিল্পী। ১৯শে এপ্রিল মেয়েটির বাবার মৃত্যুদিন অথচ নাট্য আকাদেমির পুরস্কার প্রাপ্তিতে ঐ বিশেষ দিনটি অর্থাৎ অদিতির বাবার মৃত্যুদিনটি, অদিতির মা ভুলেই গেছে। এই ছবিটিতে, ১৯শে এপ্রিল সকাল থেকে পরদিন ভোর পর্যন্ত মা-মেয়ের দ্বন্দ্ব তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য, ছবিটিতে দেবশ্রী রায়ের মাত্র দু'টি পোষাক ব্যবহার করা হয়েছে। গোলগলার টি শার্ট ও লঙ্ স্কার্ট। এই ছবিতে অভিনয়ের সুবাদে সেরা অভিনেত্রী হয়েছেন দেবশ্রী রায়। তরুণ পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষের ছবি 'হীরের আঙটি' ১৯৯৩ সালে কায়রোতে পুরস্কার পেয়েছে। ঋতুপর্ণর ছবিতে থিমেটিক ও সিনেমাটিক [illegible], ব্রিলিয়ান্স্ আছে।

[illegible] শুধু 'চলচ্চিত্র' নয়। মানুষের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির

মাধ্যম, গণমাধ্যম। 'পপুলারিটি' যদি শেষ কথা হয় তা'হলে সমস্ত প্রগতিশীল চলচ্চিত্রকারদের ছবি বাতিল করে দিয়ে পপুলার সিনেমা হিসেবে তো হিন্দিতে 'শোলে' কিংবা বাংলাতে ঐ ধরণের কিছু একটা ছবিকে শ্রেষ্ঠতার আসনে বসাতে হয়। তা'হলে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাহিনীচিত্র অরসন ওয়েলসের 'সিটিজেন কেন'-এর আসনও টলে যায়। পপুলারিটিই শেষ কথা নয়। কি বাংলা কি হিন্দি সমগ্র চলচ্চিত্র শিল্প আজ যে সমস্যার মুখোমুখি—এর কবল থেকে রক্ষা পাবে কি? প্রশ্ন জাগে ১০০ বছরের এই শিল্প মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে কি? তা শুধু ভবিষ্যতই বলতে পারে। ভয় অবশ্যই আছে। যদি চলচ্চিত্র জীবনবিরোধী না হয় এবং রাজনৈতিক দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার না করে—তা'হলে সংশয় নেই।

তথ্যসূত্র :

- নতুন বাংলা সিনেমা / ধীমান দাশগুপ্ত
- স্বপ্ন, সময় ও সিনেমা / বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত
- ফিল্ম সেন্স / আইজেনস্টাইন
- আনন্দবাজার পত্রিকা
- গণশক্তি পত্রিকা
- Indian Cinema : Contemporary Perceptions from the Thirty's / Shamik Banerjee.

সাক্ষরতার প্রসার সাধন
প্রতিটি শিক্ষিতজনের সার্বিক
দায়িত্ব ও কর্তব্য।

প্রধান,

৬/২ মনোহরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত
মনোহরপুর ☐ মেদিনীপুর

ঘাটালের শীতলা পূজা ও সঙ্ বিচিত্রা

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

ঘাটালের বিভিন্ন লোকউৎসবের মধ্যে অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠান—শীতলা পূজা। ভীমপূজা, গাজন, চড়ক ইত্যাদি যে সব লোক-উৎসব-অনুষ্ঠিত হয় তা থেকে 'শীতলা পূজা'র তাৎপর্য স্বতন্ত্র। বিশেষ করে শীতলা পূজা উপলক্ষে যে 'সঙ'-এর বৈচিত্র্য বৈভব লক্ষ্য করা যায় তা লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে গুরুত্ব বহন করে।

লৌকিক দেবী শীতলা'র বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে ঘাটাল শহর তথা তৎসংলগ্ন গ্রামাঞ্চলে যে বিরাট ব্যাপ্ত সহকারে পূজানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়—তা সত্যিই বিস্ময়কর ঘটনা। গ্রামাঞ্চলের চিত্র বাদ দিলেও মূলতঃ ঘাটাল শহরে মহাধুমধামে যে শীতলা দেবীর পূজা হয়, প্রধানতঃ তার সিংহভাগে আছে (১) আলামগঞ্জ (২) গম্ভীরনগর (৩) মালাকার ডাঙা (৭) মাড়গোড়া অঞ্চলের ভূমিকাই উল্লেখযোগ্য। এই শীতলা পূজায় বহু বৈচিত্র্যময় বাদ্য সমাবেশ এবং সঙ-বিচিত্রা অনুষ্ঠিত হয়। সঙ অনুষ্ঠানটিকে আকর্ষণীয় করতে বিভিন্ন পাড়ার মধ্যে আছে প্রতিযোগিতার মনোভাব।

আজ থেকে আনুমানিক বেড় শতাব্দির বহু পূর্বে আলামগঞ্জ ও গম্ভীরনগর এই পাশাপাশি গ্রামদুটি শুধুমাত্র পূজার দুটি ভিন্ন কেন্দ্রে পরিণত হয়। পরস্পরের বাদ্যভাণ্ড ও সঙ-বিচিত্রানুষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট পরসীমানার মধ্যেই সম্পন্ন হয়। সেই সীমানা অতিক্রম করলেই বাদ্যভাণ্ড ও সাবলীলতার রূপ নেয়। অথচ আশ্চর্য উভয় গ্রামেরই বিচিত্রানুষ্ঠানের রূপকারগণ শুধুমাত্র যে ঐ গ্রামেরই বাসিন্দা হবে—তাও নয়। গম্ভীরনগরের নাট্যকার, শিল্পী, কুশীলবরা আলামগঞ্জের পূজায় অংশগ্রহণ করে। আবার অনুরূপভাবে গম্ভীর-নগরের পূজায় আলামগঞ্জের রূপকাররা অংশগ্রহণ করে। শুধুমাত্র বাদ্যভাণ্ড এবং দোলায় দেবীর নগর পরিক্রমণকালে ঐ পরসীমানা কার্যকরী ভূমিকায় রূপ নেয়। বর্তমানে এই শোভনতার যুগে প্রাচীন এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে একেবারেই বেমানান। কিন্তু এই অস্বাস্থ্যকর মানসিকতা সভ্য শিক্ষিতের মনে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে নি।

যে যাই হোক, এই দুটি গ্রামের দ্বান্দ্বিকতার ফলে ও প্রতিযোগিতার কারণে প্রতি বৎসর সড়-নাটাগুটানের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে জন্যই পূর্বকালের পরস্পর গ্রামের কেচ্চা-কেলেঙ্কারি ভিত্তিক সড়-নাটাগুটানের পরিবর্তে বর্তমানে এপদী নাটাগান এর উদ্ভব হয়েছে এবং তা জনচিত্তজয়ী রূপ ধারণ করেছে। এই যে সড়-নাটাগুটান, অতীত এবং বর্তমানের প্রেক্ষাপটে তার বিবর্তনের রূপরেখাটি অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

ঘাটালের শীতলাপূজা—মহাপূজা। সচরাচর আমরা বারোয়ারী উৎসবকেই জাতীয় উৎসব বলে থাকি। ঐ সময় নূতন পোশাক, আত্মীয় অভ্যাগতদের আগমণ ইত্যাদির মাধ্যমে উৎসবকে আমরা প্রাণবন্ত করে তুলি। কিন্তু ঘাটালের এই অঞ্চলে শীতলা পূজায় যে কোন গ্রামের পূজাকে কেন্দ্র করে নূতন পোশাক পরিধান এবং আত্মীয় আগমনের ঘটনা ক্ষুদ্রাংশে যে ঐ গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়। যেহেতু গ্রামগুলির পূজা পর পর শনি অথবা মঙ্গলবারে অনুষ্ঠিত হয়—সেহেতু এক গ্রামের পূজা হলেই পাশাপাশি গ্রামের বাড়িতে আত্মীয়দের আগমন ঘটে এবং পাশাপাশি গ্রামের পূজাদের তাদের প্রস্থান ঘটে। সুতরাং বৈশাখ মাস থেকে আষাঢ়ের মধ্যবর্তী সময় পরস্পর কলকাকলিতে গৃহাঙ্গন মুখরিত থাকে। এবং নিরুপায় হলেও, গৃহকর্তার নাভিশ্বাস উঠলেও শুকনো হাসিমুখে তা মেনে নিতে হয় জাতীয় উৎসবের মুখরতা ঘাটাল অঞ্চলে এই সময় শীতলা পূজার উৎসবের কাছে ম্রিয়মান হয়ে যায়।

ঘাটাল অঞ্চলের মূলতঃ চারটি গ্রামের পূজার মধ্যে শুধুমাত্র গম্ভীরনগর গ্রামে সাতটি পাড়ায় পূজা একই দিনে হয় বলে তাকে 'সাতপাড়া শীতলা পূজা'ও বলা হয়। সাতপাড়া বলতে— ১) হাটপাড়া (২) কামার পাড়া (৩) মাঝুই পাড়া (৪) আচার্য পাড়া (৫) কুমার পাড়া (৬) মিশ্র ব্রাহ্মণ পাড়া ও (৭) গোয়ালাপাড়া।

আলামগড়ের পূজা বৈশাখ মাস, গম্ভীরনগর ও আড়গোড়ার পূজা জ্যৈষ্ঠ মাস এবং মালাকার ডাঙার পূজা আষাঢ় মাসে অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া পাশাপাশি অঞ্চলের শীতলা পূজা ঐ সময়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। শনিবার বা মঙ্গলবার মূল পূজা হলেও পূজার আগের দিন রাত্রে সুসজ্জিত মন্দির প্রাঙ্গণে 'মাতার জাগরণী' গান হয় এবং ঐ দিনই প্রধানতঃ গম্ভীরনগর

সাউথপাড়ার মুকাগ্নি, কুমোর পাড়া, কামার পাড়া থেকে 'পায়েল সঙ্', (পায়ে হাঁটা সঙ্) বের হয় এবং হাট পাড়া, কামার পাড়া থেকে রূপদী নাট্যানুষ্ঠান বের হয়। পূজার দিন সকালে 'আবাহনী গীত' (মাঙ্গলিক গীতি) পরিবেশিত হয়। নব পোশাকে বালক-বালিকারা সিদ্ধিল সহযোগে সমবেত কণ্ঠে গান করতে করতে নগর পরিভ্রমণ করে আর হাতে হাতে বিলি করে ঐ দিনের অনুষ্ঠান তালিকার (প্রোগ্রাম) ছাপানো কাগজ। তারপর পর্যায়ক্রমে সকালে এবং রাত্রে শুধুমাত্র মালাকার ভাঙা ছাড়া সব জায়গাতেই টাকে মঞ্চ তৈরী করে নাট্যানুষ্ঠান হয়। মালাকার ভাঙায় নীলাবতী নদীতে নৌকার উপর মঞ্চ তৈরী করে নাট্যানুষ্ঠান সংঘটিত হয়। গম্ভীর-নগর মিশ্রপল্লীর ফুল সাজে সজ্জিত দৃষ্টিনন্দন মঞ্চ দর্শক উৎকর্ষের দাবী রাখে।

সঙ্-নাট্যানুষ্ঠান সূচনালগ্নে যে রূপ নিয়ে জনমানসে বের হতো, তা অতি লজ্জার ও ধিক্কারজনক। গ্রামের কোন লজ্জাজনক ঘটনাকে ব্যঙ্গ গানে রূপান্তরিত করে পূজার দিন কুশীলবগণ কোনোরকমে মুখে রং মেখে পায়ে হেঁটে হেঁটে নগর পরিক্রমা করত এবং তা পরিবেশন করত। অবশ্যই তা হাস্যরসের বিষয় ছিল।

যতদূর শোনা গেছে গম্ভীরনগর গ্রামের থেকে প্রথম সঙ্-নাট্যানুষ্ঠানের জন্ম হয়। বহু ব্যয় করে কয়েকটি ঘোড়া সহ রেলগাড়ী তৈরী হয়েছিল। তাতে মানুষজন বসে গান করত আর গ্রামের প্রধান প্রধান রাস্তায় বের হত। পরে পরে 'রাজার পুকুর' নামে পুষ্করিণীর মাঝে মাচা বেঁধে 'কালীয় দমন', বিষ্ণুর 'অনন্ত শয্যা' এবং 'গোপীদের বস্ত্র হরণ' অনুষ্ঠান হয়েছিল। গম্ভীরনগর গ্রামের কামার পাড়ায় স্থানীয় চরেকৃষ্ণ রাণার উদ্যোগে লোহার তৈরী মঞ্চ তৈরী হয়। সেটি লোহার গোলাকার রিং সম্বলিত তিনটি স্তবকে সজ্জিত। বিয়ারিং থাকায় তিনটি স্তবক ঘোরানো হত এবং প্রত্যেকটি রিং স্তবকে চার-পাঁচজন গোপিনী থাকত; গোপিনীরাও প্রত্যেকে বিয়ারিং প্রথা থাকায় ঘুরে ঘুরে গান করত। সবার উপরের স্তবকে থাকতো রাধা-কৃষ্ণ। একে আমরা এখনও 'রাসলীলা মঞ্চ' বলা হয়। প্রতি বৎসর না হলেও এখনো মাঝে মাঝে 'রাসলীলা' প্রদর্শিত হয়। ধীরে ধীরে কেচ্ছা সঙের বদলে রুচিশীল নাটক মঞ্চস্থ হতে শুরু হল এবং তা বর্তমানে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক

নাটকের পরিবেশনের ক্ষেত্রে বিশেষ নৈপুণ্যের ছাপ স্পষ্ট করে দিতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে ঘাটাল অঞ্চলের নাট্যকার, গীতিকার, কণ্ঠশিল্পী ও অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ সমস্ত শীতলা পূজায় অংশগ্রহণ করে আসছেন। বর্তমানে নাট্যানুষ্ঠানের যে পরিশীলিত রূপ পূজানুষ্ঠানে প্রকাশ পায়; তা যেমন ব্যয় সাপেক্ষ তেমনি অনুশীলনযোগ্য। বাইরের থেকে দামী দামী অভিনেত্রী আনতে হয় এমনকি নাটকের প্রয়োজনে কলকাতা থেকে লাইট, মাইকও আনতে হয়। সঙ্-এর মধ্যে নূতন নূতন শিল্প সৃষ্টির মূলে স্বর্গীয় সুবল কুচলান ও গোপাল দে'র অনবদ্য কীর্তি স্মরণীয়।

সঙ্-বিচিত্রানুষ্ঠানে যে সব নাটিকা মঞ্চস্থ করা হয়, তার সময়কাল মোটামুটি আধঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এই সময়কালের মধ্যে নাটিকার বিষয়বস্তু, গতি, অভিনয় দৃঢ়ভাবে বাঁধা থাকে। এই অল্প সময়ের মধ্যে নাট্যকার যে নাট্য-নৈপুণ্যের উপাদানগুলি সংযোজন করেন—তা' নাট্য রচনার ক্ষেত্রে গবেষণার ব্যাপার। সঙ্-বিচিত্রানুষ্ঠানে নিম্নবর্ণিত নাট্য নিবেদন চোখে পড়ে।

(১) হাসির নাটক (২) বাস্ব কৌতুকী (৩) সমসাময়িক ঘটনা কেন্দ্রিক সামাজিক নাটক (৪) শিশু রূপকথা (৫) গীতিনাট্য (৬) ভক্তিমূলক নাটক (৭) পৌরাণিক নাটক (৮) ঐতিহাসিক নাটক (৯) বিদেশী নাটক (১০) জমিদার-বাঈজী সম্বলিত নাটক ইত্যাদি।

বিভিন্ন সময়ে সঙ্-এর নাটক লিখেছেন—স্বর্গীয় কার্তিক পাল, স্বর্গীয় বীরেন দে, বিজন ভট্টাচার্য্য, শ্যামল হড়, সুবল রাণা, কানাই বাস্কর, বিষ্ণু ব্যানার্জী, অনুকূল চক্রবর্তী, তরুণ পাল, ভোলা মল্লিক, শান্তনু পাল ও জয়ন্ত দালাল।

নাটকগুলির বিশেষ আকর্ষণ গান। বিভিন্ন সময়ে গান রচনা করেছেন—৺রাসবিহারী আচার্য্য, বিমল গাঙ্গুলী, বিজন ভট্টাচার্য্য, বিষ্ণু ব্যানার্জী, শান্তনু পাল, অনুকূল চক্রবর্তী, কানাই বাস্কর, জয়ন্ত দালাল ও রাধাশ্যাম পাল, ৺ভবসিন্ধু দাস।

সুর ও কণ্ঠ দিয়েছেন—হরেকৃষ্ণ অধিকারী, রাধাশ্যাম পাল, প্রহ্লাদ কবি, চণ্ডী হড়, ৺নিরঞ্জন সামুই, দিলীপ ব্রহ্ম, ৺সত্য আঢ়ক, ৺বিমলেন্দু দোলুই, বিজন ভট্টাচার্য্য, সনাতন বাঙ্গাল ও মল্লিকা দত্ত, শ্যামলী বাগ, প্রভাতী দাস, বীণা পাল, সোনালী বাগচি, প্রতিমা ভট্টাচার্য্য, নির্মল ভৌমিক, সিদ্ধার্থ দে, দেবাশিস মণ্ডল, মুকুল আনসারি, বুদ্ধদেব বেরা, টুলটুল চক্রবর্তী।

এবার লোক সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে ঘাটালের 'সঙ' লোক-নাট্যের এই বিশেষ রূপটির তাৎপর্য নির্দেশ করা যেতে পারে। ভারতের বিভিন্ন ঋতু, বিভিন্ন পূজা, অনুষ্ঠান-উৎসবকে কেন্দ্র করে লোকনাট্য গড়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে 'যাত্রা' লোকনাট্যের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। কিন্তু একালের যাত্রা লোকনাট্যের স্বরূপ থেকে দূরে সরে গেছে। অন্যদিকে সমসাময়িক উৎসব উপলক্ষে সামগ্রিক প্রসঙ্গ নিয়ে যে 'সঙ' গড়ে ওঠে তার স্বভাবে নিহিত আছে লোকনাট্যের অধিক প্রবণতা। সেখানে কায়িক ও বাচিক উভয় প্রকার অভিনয় ধারার যৌথ সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ঘাটালের শীতলা পূজার সঙ্-মাট্যানুষ্ঠানের প্রথম পর্বে লোকনাট্যের লক্ষণ বিশেষ অনুসৃত হয়েছে। বর্তমানে তা থেকে সঙ্ ক্রমশঃ দূরে চলে যাচ্ছে বিশেষ করে আধুনিক যুগ ও রুচির প্রেক্ষাপটে সঙ্-এর যেমন বিষয়গত পরিবর্তন ঘটেছে তেমনি আঙ্গিকেও দ্রুত রূপান্তর ঘটছে। লোকঐতিহ্যের অন্যান্য উপকরণের ক্ষেত্রেও যেমন আধুনিকতা তথা নাগরিক রুচিকে গ্রহণ করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে, ঘাটালের 'সঙ'-এর মধ্যেও তা ঘটেছে। আগামী দিনে তার মধ্যে হয়ত আরো রূপান্তর ঘটতে পারে

আনন্দময়ীর আগমনে
সবার মন আনন্দে
প্লাবিত হোক ঃ

দোলন জানা
কুশপাতা ঃ ঘাটাল ঃ মেদিনীপুর

শারদ উৎসবের মুহূর্তে
আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
গ্রহণ করুন ঃ

শ্রীদুর্গা স' মিল

প্রোঃ—তরুণকুমার রায়

শাল, সেগুণ ইত্যাদি নামী ও দামী কাঠ
উচিৎমূল্যে পাওয়া যায়।

রাধানগর [] মেদিনীপুর

লোকটা

শ্যামাপদ প্রামাণিক

লোকটা প্রতিদিন সাত সকালে পিঠে পলি নিয়ে
সব কুয়াশা ভেঙে, অলিতে-গলিতে দু'হাতে কাগজ
আর কাঁচ কুড়াত ; মহাজনের দুয়ারে বিক্রী করে
অন্ধকারের সংসারে আলো আনত ;

দিনের পর দিন লোকটা পথকে বন্ধু করেছে
বন্ধুরকে করেছে, সরল ; তাকে দেখা যেত শহরের
বিভিন্ন রাস্তা ও নর্দমার পাশে.....সে আবর্জনার জঙ্গল
থেকে তুলে নিত অর্থ পাবার পথ।

অন্যদিনের মত ঘুরতে ঘুরতে পিঠে বিশাল বস্তা নিয়ে
একদিন সাহস করে ঢুকে পড়ে কলোনীর মধ্যে—
সাইনবোর্ডের বড় বড় অক্ষর পড়ার মত জ্ঞানও তার ছিল না
সে সংগ্রহ করছিল কাগজের টুকরো আর ফেলে দিয়া জিনিষপত্র

কলোনীর দারোয়ান নিরীহ লোকটাকে
সক্রোধে মারল·· লাথিপ্লোষ্টে বেঁধে রাখল ; নর্দমায়
ছুঁড়ে দিল তার বিশাল চটের থলে.....
লোকটা প্রতিবাদ করল না ;
বরং প্রকাশ করল বেঁচে থাকার ইচ্ছা—
উজ্জ্বল আলোর প্রত্যাশা
যে আলোর মুখে ফুটবে ভাষা।

লোকটাকে লক্ষ্য করা জরুরী। এই সময়ে.....
হয়ত প্রাচীর ভেঙে এবার সে এগিয়ে যাবে।

পথ দেখাও

রাম মাইতি

হে মহাজীবন,
এবার আমাদের পথ দেখাও
আমরা এক বিমূঢ়
যুগের দ্বারে দাঁড়িয়ে আছি ;
পৃথিবী ভাগ হচ্ছে, দেশ ভাগ হচ্ছে,
মানুষ ভাগ হচ্ছে।
আবার তার মাঝে দেখছি
পশ্চিমের নোংরা থাবা,
হে মহাজীবন পথ দেখাও।

ওরা বলছে, বিশ্ব সংস্কৃতির জোয়ার এসেছে,
ভেসে চলো, 'ফ্যাশান প্যারেডে'
চলো যাই পার্টিতে—
মানুষের আধুনিকতম মডেলে।
বুকে চেপে আছে নরম যৌন ম্যাগাজিন,
মাথায় খুশবন্ত সিং ;
'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'আরণ্যক', 'গণদেবতা'
ওদের অচেনা।
বিরাট আই কিউ নিয়ে ওরা খেয়েছে
কত নরম শরীরের মধুর স্বাদ,
অথচ আমাদের সামনে জমে আছে
অনেক অন্ধকার ;
হে মহাজীবন,
এবার আমাদের পথ দেখাও।

এ কোন্ দেশ……

……

ডাঃ সুদর্শন রায়

প্রহরের নিটোল শয্যায় স্বপ্নেরা হেঁটে যায়
অন্ধকার হলুদ রোদের মই বেয়ে উঠে যাই
নূতন দেশে।
এ কোন্ দেশ……, শস্য সবুজ কৃষক বিহীন,
ঘর ভিটা মাটি সব বন্ধক হয়ে যায়……
চোখের জলে চাঁদ ডোবে ; তবু উষ্ণবুক ভালবাসা
শুকোতে দিই হলুদ রোদে, পড়ে থাকে—
আঙিনায় সাদাসিদে জীবনের আহ্লাদ।
এ কোন্ দেশ……, শূন্য বাগান…শূন্য ক্ষেত…
অতীতের উপাখ্যান বুকে নিয়ে জননীর চিতা সাজাই,
এখন ভালবাসা ও ইতিহাস পরস্পর সংগ্রামমুখর
হয়ে ওঠে, আমি তবু স্বপ্ন দেখি নূতন দেশের ?

তোমার মন

জয়দেব মূলী

নীলিমা থেকে ঝরে পড়া নীল
তোমার শাড়ীর রং বদলাতে পারে
কিন্তু তোমার মন বদলালো কিভাবে ?
তুমি চেয়ে থাক আকাশের দিকে
আমার কথা মনেও পড়ে না তোমার,
অথচ একদিন তুমি ঘুমের মধ্যেও আমাকে দেখতে।
কালস্রোতে পৃথিবীর রূপ বদলায়—
প্রেম-ভালবাসা থাকে অমলিন
সে অমরতা হাতছানি দেয় আমাকে
বারে বারে ডাকে নিয়তির মতো।

স্বেচ্ছাচার

অরিন্দম পৃথিবী

আমাকে একটা গীতা দাও
জনসাধারণকে গর্জিয়ে করে বলি
আচরণে অপরাধ এনে
মুখে তোমাদের ধর্মের নগ্নরূপটি ।
ধার্মিক কি আর ধান্দা করে
ধরাকে শুধুই ছলনা করে ?

আমাকে একটা কোরাণ দাও—
জনতাকে কর্কশ সুরে বলি
আচরণে অসভ্যতা এনে
মুখে তোমাদের আল্লার আগা মরি.
আল্লা কি আর ভল্লা করে
প্রকৃতিকে শুধুই বিকৃত করে—
বিরত থাক স্বেচ্ছাচারে ।

আমাকে একটা বাইবেল দাও
জনতাকে জোর করে বলি—
আচরণে অন্যায় এনে
মুখে তোমাদের ফাদারের কোলাকুলি.
ফাদার কি আর ফন্দি করে
ধরিত্রীকে শুধুই আঁধার করে
অ-ন্যায্য বাড়াও কারবারে ।
দেবে না তুমি ?
গীতা বাইবেল কোরাণ
শুনবে-না কি.?
গড্ আল্লা ঈশ্বরের তয়রান
তবে করবো না আর
শুনবো না আর
ধর্ম আর ধার্মিকের জয়গান ।

বরণীয়া

[প্রয়াত লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী স্মরণে]

রামমোহন সামন্ত

সংসারের মধ্যে থেকেও
সংসারের শেকল ছিঁড়ে
হাতে নিয়েছিলে কলম।
বন্ধ ঘরের খোলা জানালা দিয়ে
তুমি দর্শন করেছিলে
বিশ্বরূপ।

গোটা মানব সংসার
তোমার কলমে পেয়েছে
মাথা গোঁজার ঠাঁই—
খুঁজে পেয়েছে নিজের ভাষা।
মানুষ ও সংসারের যত অন্ধকার
সাহিত্যের পাতায় করেছ
আলোকিত ;
নক্ষত্রলোক থেকে
নারীমুক্তির যে স্বপ্নে
তুমি বিভোর ছিলে
মর্ত্যের মানুষ
সেই স্বপ্নে সেই আদর্শে
উজ্জীবিত ;

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত
জীবন যুদ্ধে হাতিয়ার ছিল
তোমার লেখনী
সাহিত্যের জগতে তুমি
বরণীয়া।

সবিনয় নিবেদন

ক্ষুদিরাম মণ্ডল

ছত্রিশ লক্ষ শব্দের ঢাউস পত্রিকায়
ছত্রিশটা শব্দ নেই গাঁয়ের জন্য
অথচ নীরবে নিভৃতে
কত বিপ্লব হয়ে গেল গাঁয়ে
সবুজ বিপ্লব, রক্তাক্ত বিপ্লব
রাজ্যপাটে রাজা যায় রাজা আসে
তবুও গাঁয়ের লোকের দুঃখ ঘোচে না
শাঁখ-বাজা অন্ধকার চিনে ঘরে ফেরে
শূন্য বুকে হতাশা আর বঞ্চনা নিয়ে
গাঁয়ের লোক খুব ভাল করে বুঝে গেছে
বন্যা হ'লে ভাসতে হবে
শীতে-জাড়ে মরতে হবে
খরা-শুখায় ধুঁকতে হবে
এর থেকে পরিত্রাণ নেই
তাতার, তুর্কি, মোঘল, পাঠান, ইংরাজ
সব দেখেশুনে
মাটির দাওয়ায় থিতু হয়ে বসেছে হাত গুটিয়ে।

মধুলোভী লুটেরা নতুন কুৎ-কৌশলে
গাঁ গঞ্জের গলা টিপে ধরছে
জটিল রাজনীতির জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে যারা
তাদের জন্য কিছু শব্দ, বাক্য, চিত্রকল্পযোগে
নিদেনপক্ষে একটা কবিতাও থাকবে না ?
কিন্তু কবি নাচার।

হেমবর্ণ

সুদর্শন চক্রবর্তী

ঝড় আসছে
চিতাবহ্নি ঝড়
চেটে নিচ্ছে
বুকের তলে
যত্নে রাখা
সুগন্ধ চন্দন

ও বাধা বন্ধন
পূর্ণপ্রীতি
শস্যল মেঘ
ঊর্ধ্বাকাশে
মৃগাত্রাসে
ভেসে যাচ্ছে

অতো
আমি এবং কীর্তনীয়া নারী
ঘুমিয়ে গেছি
এক কফিনের তলে

হেমবর্ণ
জ্বলে আগুন জ্বলে……

সুদর্শন চক্রবর্তীর কবিতা পড়ুন
কাব্যগ্রন্থ ঃ 'আবাহন'

গয়না

নিমাই করণ

মাঠ মেয়েকে গয়না দিলাম সোনার গয়না
মাটির ঢেলা রাগ করেছে কথা কয় না।
বায়না করে আঁকড়ে ধরে কৃষক পা
গামছা বলে মেয়ে আমার আমার মা।
বরবটি আর সিমের ফুলে জড়াজড়ি
বিষের বনে ফল ধরেছে ছড়াছড়ি।
আলুর গাছে আলতা পরে দোয়াশ মাটি
তাই না দেখে ঝনাৎ-ঝনাৎ আমন ধানটি
এমন সময় বর্ষা এল কাব্যগীতি
ছলাৎ-ছলাৎ কলমি শাকের অনুভূতি।
বরবটি আর রকমারি ফুল রকম রকম
অলঙ্কারের অনেক বাহার অনেক রকম.
হলুদ গাঁদা রক্ত আবার বাসন্তী হয়
অপরাজিতা সাদা হলে নীলিমাময়।
কিন্তু হঠাৎ বরং তবু চমকে দেখি
সবুজ মাঠে চোখের জলের অনুভূতি।

কবি নিমাই করণ-এর কবিতা পড়ুন
কাব্যগ্রন্থ ঃ 'যে মেয়েটি হাটে বসে লঙ্কা বেচে'

অপেক্ষা

দিলীপকুমার বাগ

রাত্রের আকাশে তারারা যখন ঝিকমিক করে,
সমাগরা পৃথিবী যখন ঘুমে থাকে আচ্ছন্ন
রাত পাখিটার করুণ আর্তনাদে যখন দিকবিদিক্
হাহাকারে ভরে যায়
তখনও আমি তৃষিত হৃদয়ে উন্মুখ থাকি
তোমার অপেক্ষায়।

জোনাকির ক্ষীণ আলো যখন নিভু নিভু হয়,
আধফালি চাঁদ যখন সরষে ক্ষেতে ঢলে পড়ে
আঁতুর ঘরে নবজাতক যখন ককিয়ে কেঁদে ওঠে
তখনও আমি তাহার বিরহ বুকে নিয়ে জেগে থাকি
তোমার অপেক্ষায়।

গভীর অরণ্যে কাঠপেঁচা যখন কর-কর শব্দে
ভয়ঙ্কর নীরবতা ভেঙে দেয়—
ঝিঁঝিঁর একটানা বেসুরো আওয়াজ যখন ঝালাপালা করে
তখনও আমি কল্পনাতীত স্বপ্নের জাল বুনি,
তোমার অপেক্ষায়।

বাঁশবনের আবছা ছায়া, বন্য প্রাণীর হিস্ হিস্ শব্দ
অশরীরী অবাস্তব কল্পনা, তেরচা আলোয় রক্তের ঝিলিক,
কোথায় যেন অর্ধস্ফুটে ফিসফিসানি—ভয়ে বুকের পিঞ্জর
মুচড়ে দেয়।
তখনও আমি নির্জন ভাবনায় দিন গুনি
তোমার অপেক্ষায়।

'সৃজন'কে
শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই ঃ

আরোগ্য নিকেতন

ন্যাসিংহোম কাম মেটারনিটি সেণ্টার

শ্যামসুন্দরপুর ঃ দাসপুর ঃ মেদিনীপুর

- দাসপুরে প্রথম প্রতিষ্ঠিত আমাদের প্রতিষ্ঠান আপনাদের সেবায় সদা প্রস্তুত।
- অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ আমাদের প্রতিষ্ঠানের গৌরব।
- আধুনিক চিকিৎসা এবং বিজ্ঞানসম্মত অপারেশান থিয়েটার আমাদের গর্ব।
- উন্নতমানের এক্স-রে যন্ত্রদ্বারা এক্স-রে করা হয়।
- সমস্ত প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা অভিজ্ঞ প্যাথলজিস্ট দ্বারা এখানেই সম্পন্ন করা হয়।
- নিজস্ব ফার্মেসী থাকাতে উপযুক্ত মানের ঔষধ পাওয়ার কোন সমস্যা নাই।
- কলিকাতা থেকে আগত প্রসিদ্ধ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন ধরণের জটিল ব্যাধির চিকিৎসা করছেন।

রাজনীতি ও সমরেশ বসুর গল্প

অরুণকুমার পাল

রাজনীতির সঙ্গে গল্পকার সমরেশ বসুর সম্পর্ক তারাশঙ্কর, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে ভিন্ন ধরণের। কেন না সাহিত্যচর্চা শুরু করার আগেই সমরেশ রাজনীতিতে প্রবেশ করেন, নিজেকে তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এঁরা কেউই প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। শরৎচন্দ্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রায় মধ্যাহ্নে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যিক হবার পরই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। কিন্তু সমরেশ বসু যুক্ত হন সাহিত্যিক হবার আগেই, ১৯৭৭ সালে. তখনও সাহিত্যিক হিসেবে তিনি বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হননি। কারণ ১৯৭৮ সালে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত 'আদাব' গল্পটিই তাঁর সাহিত্যিক জন্মলগ্ন বলে।

আত্মকথায় সমরেশ লিখেছেন,—"আমি আর গৌর ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি পার্টি সদস্য পাই। এই গৌর বা গৌর নিয়োগীর সমরেশের অন্যতম বন্ধু ছিলেন সমরেশ বসু রাজনীতি সূত্রে এবং জীবনধারণ সূত্রে একটি বিশেষ শ্রেণীর এবং সংলগ্ন গ্রাম এলাকার কঠোর সংগ্রামী মানুষদের সংস্পর্শে আসেন। দামোদরপুর মহকুমার এই শ্রেণীকলের কুলি-কামিন-মজুর এবং অন্যান্য পেশার নিচুতলার সঙ্গে মেলামেশার সূত্রে এদের জীবনের অন্তর্নিহিত যেমন জানার সুযোগ পেয়েছিলেন, তেমনি এই মানুষদের রাজনৈতিক চেতনা, রাজনীতি সম্পর্কে মনোভাব জানার সুযোগও তাঁর ঘটেছিল। এই সুযোগ এবং অভিজ্ঞতার বাস্তব প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় সমরেশের অনেকগুলি ছোট গল্পে, যাতে অনিবার্য ভাবে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এসেছে। চল্লিশের দশকের রাজনৈতিক পরিস্থিতিই সমরেশ বসুর অনেকগুলি ছোট গল্পে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে চিত্রিত হয়েছে।

চল্লিশের দশকের রাজনৈতিক পটভূমি নিয়ে লেখা প্রবোধকুমার সান্যালের 'অঙ্গার', মনোজ বসুর 'কনট্রোলের লাইন', নারায়ণ

গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হাড', নবেন্দু ঘোষের 'কস্তি', সুবোধ ঘোষের 'ফসিল', 'গোত্রান্তর', মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারাণের নাতজামাই', 'ছোটো-বকুলপুরের যাত্রী' ইত্যাদি গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য। এই রাজনৈতিক পটভূমিতেই সমরেশ বসুর প্রায় ত্রিশটি গল্প রচিত হয়েছে।

১৯৪৬ সালে 'পরিচয়ে'র শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত 'আদাব' গল্পটি সমরেশ বসুর প্রথম গল্প এবং প্রথম রাজনৈতিক গল্প। এরপর 'নতুন পোকা' (পরিচয় ১৯৪৬) 'প্রতিরোধ' (পরিচয় ১৯৪৭) 'মৃত্যুঞ্জয়' (পরিচয়, ১৯৪৭) 'জলসা' (পরিচয়, ১৯৪৭) 'একশো চারজন' (পরিচয়, ১৯৫২) 'একটি মৃত' (পরিচয়, ১৯৫২) 'অভিযাত্রী' (পরিচয়, ১৯৫৪) 'শের সর্দার', 'মানুষ', 'মরেছে প্যাগলা কয়সা', 'লেগে লেগে যা', 'স্বীকারোক্তি' প্রভৃতি যুগান্তকারী রাজনৈতিক গল্পগুলি তাঁর লেখনী থেকে বেরিয়ে আসে।

সমরেশ বসুর প্রথম প্রকাশিত 'আদাব' গল্পটিতে সমসাময়িক রাজনৈতিক অস্থিরতার চিত্রটি ধরা পড়েছে। এক মুসলমান মাঝি ও এক হিন্দু সুতা শ্রমিক দাঙ্গাবিধ্বস্ত কার্ফিউ শাসিত ঢাকা শহরের জনবহুল এক রাস্তে পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে পড়ে হঠাৎ। অবিশ্বাস দ্বিধায় দীর্ণ এই দুই 'সাম্প্রদায়িক বিজেতের যখন মানুষ বলে চিনতে পেরেছে, পরস্পরের নিরাপত্তার আশঙ্কায় প্রকৃতই যখন উদ্বিগ্ন তারা, প্রায় তখনই, ইংরেজ নিরাপত্তারক্ষীর হাতে প্রাণ হারাল সেই মাঝি! গল্পটিতে যেন আসন্ন দেশভাগের ইঙ্গিত রয়েছে। ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণের কথা মনে করিয়ে দেয় 'আদাব'। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যখন অনৈক্যের চোরাবালিতে নিমজ্জিত, বৃটিশ শাসক যখন আমাদের ভ্রাতা, যে রাষ্ট্রিক ঐক্যের সাধনা করেছিল দেশ তা যে ব্যর্থ হতে যাচ্ছে—সেই ইঙ্গিতই ধরা পড়েছে 'আদাব' গল্পে।

সমরেশ বসু রাজনৈতিক গল্পে মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা, নীচতা বা অন্যান্য দোষের কথা এসেছে বারবার। আন্দোলনের ভরাডুবির জন্য দায়ী করা হয়েছে তাদেরই। সর্বহারা লড়াকু শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিবাদী আন্দোলন উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে প্রতিহত। কিন্তু এজন্য গোটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে দায়ী করা চলে না, দায়ী মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব। এই মধ্যবিত্ত নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি সমরেশের চরিত্র গঠনে সহায়ক হয়েছিল। তাঁরাই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে পার্টি নীতি ও কর্মসূচি তৈরী করেছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির

নেতৃত্বাধীন প্রতিবাদী আন্দোলনের সোপান তৈরী হয়েছিল সেই সর্বসূত্রকে ভিত্তি করে। চল্লিশের দশকে কারখানাগুলিতে আন্দোলন যে উত্তাল হয়ে উঠেছিল, সেখানে শ্রমিকদের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। কিন্তু মধ্যবিত্তের বক্তব্যরা নেতৃত্ব অস্বীকার করার উপায় ছিল না। শ্রমিক-কৃষক স্বার্থেই তাঁরা সওয়াল করেছেন। তবে বিচ্যুতি তো ছিলই। কোনো কোনো নকল নেতার মধ্যে লোভ, সুবিধাবাদ, স্বার্থান্বেষণ এবং নকল সেন্টিমেন্ট মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। এই রকমই একটি রাজনৈতিক গল্প 'কটিচার' (পরিচয়, ১৯৭৫)।

'কটিচার' গল্পে কয়েকটি বিস্তার মালিক রতন সর্বদাই তার তাড়া খাওয়ানো বিশ্বাসকদের কাছে একজন রাজনৈতিক নেতার মত বক্তৃতা দেয়, একদিন মজদুররাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। মালিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ভেতর দিয়ে কীভাবে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ কায়েম হবে সেকথা বলতে বলতে আবেগে রতনের গলা বুজে এলেও কিন্তু বিশ্বাসকদের কাছ থেকে হিসেব করে পয়সা নেবার ব্যাপারে ওর খুব কড়া। সব অনুরোধেও সে গলে না। রতনের স্বপ্নপ্রতিম বিপ্লবের কথা শুনতে শুনতে একদিন বিশ্বাসকেরা রতনের বিরুদ্ধেই স্ট্রাইক করে বসে রতনকে বাধ্য হয়ে বলতে হয়, 'মুকুব'। তবে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বুড়ো মিস্তিরি, শ্রমিকদের লড়বার পরামর্শ দেবার জন্য যাকে মালিক কারখানা থেকে বের করে দিয়েছে, সেই মিতভাষী বুড়ো মিস্তিরি, রতনকে সুন্দর ব্যাপ্যা করে,—"খালি বাত্। খালা কটিচার। দেখে লে, কাবা একদিন দুনিয়া বিগড়ে দেবে।" গল্পটিতে চরিত্রায়ণের নিপুণতার সঙ্গে মিশেছে বুদ্ধিসর্বস্ব ভণ্ড রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশ্যে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ।

ক্ষমতা দখলের জন্য মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের অর্থবন্ধের বিষয়টি সমরেশের লেখায় বারবার ঘুরে-ফিরে এসেছে। চারের দশকে বাংলার গোটা বিপ্লবী মহল জুড়ে কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক কাজকর্ম ও নেতৃত্বের ফলে শ্রমিক আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠেছিল। চটকল শ্রমিকদের মধ্যে পার্টির প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বার্থপরতা, নীচতা ও ষড়যন্ত্র সেই আন্দোলনকে ব্যাহত করেছিল। এই সময়কার রাজনৈতিক আবর্তের একটি বিস্তৃত বাস্তব ছবি এঁকেছেন সমরেশ বসু তাঁর 'মানুষ' গল্পে। এই গল্পের অন্যতম চরিত্র ধীরেনকে পার্টির

সেন্ট্রাল কমিটি মফঃস্বল শিল্পাঞ্চলে সংগঠনের জন্য পাঠায়। সেখানে সে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তোলার জন্য একটা স্বতন্ত্র জোট তৈরী করে। সকলের মাস্তু সং নেতা ধ্রুবকে চিরদিনের মতো সরিয়ে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করতে থাকে। ধ্রুব খুন হয়। ধ্রুব একসময় একটি চিঠিতে ভগবতী দিদিকে লিখেছিল, উত্তর কলকাতার কোনো ক্লাবের ব্যায়ামবীর ধীরেশ ছেচল্লিশের দাঙ্গায় হিরো হয়ে ওঠে। তারপর স্থানীয় এক নেতার সংস্পর্শে পার্টিতে আসে। "এভাবে সভ্যপদ পাওয়া এবং চিন্নবী হয়ে ওঠা, আমার কাছে খুব বিপজ্জনক মনে হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজ থেকে রাতারাতি বিপ্লবী হয়ে ওঠা একটা বিস্ময়কর অবিশ্বাস্য ব্যাপার।"

পার্টির নেতৃত্ব, নীতি ও কর্মপন্থার যে কোথাও একটা ফাঁক থেকে গিয়েছিল সে সম্পর্কে ধ্রুবর মনে সংশয় ও সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। ধ্রুবর অনুগামী এবং হাতে তৈরী পার্টি কমরেড খুন্তিত ধীরেশকে ধরে আনে। মূল উদ্দেশ্য স্বীকারোক্তি। ধীরেশ বলে—"আমি যদি ধ্রুবকে খুন করে থাকি, তাহলে পার্টির আমাকে শাস্তি দিতে পারে।" খুন্তিতের তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি গোল আড়াল ভেঙে সত্য প্রকাশ করে দেয়—"যে শ্রেণীর নেতৃত্বের কথা বলা হয়, পার্টি এখন সেই শ্রেণীর নেতৃত্বের নাগালের বাইরে, তাই বুরুনির মধ্যে মাথা চাড়া দিয়েছেন।"

১৯৬৩ সালে 'ছোটগল্প নব নিরীক্ষা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'স্বীকারোক্তি' গল্পের মধ্যে প্রায় একই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

"প্রসঙ্গ ভারতীয় কমিউনিস্ট (মার্ক্স) পার্টি ও আমি" প্রবন্ধে সমরেশ বসু বলেছেন—"কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসার পরেই আমার চারপাশের জগৎ ও মানুষ সম্পর্কে দৃষ্টি সজাগ হয়। আমার অভিজ্ঞতার প্রসার ঘটে।" ১৯৪৭ সালে পার্টির সদস্যপদ পাওয়ার আগে ও পরে তিনি নিরলসভাবে শ্রমিক সংগঠনের কাজ করেছেন। তাঁর কাজ ছিল চটকল এলাকার শ্রমিকদের সংগঠিত করা। শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিবিড় হয়েছে। পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা তাঁর ভবিষ্যতের পাথেয়। ব্যাপক জীবন অভিজ্ঞতায় তিনি উপলব্ধি করেছেন শুধুমাত্র রাজনৈতিক তত্ত্ব দিয়ে মানুষকে সম্পূর্ণভাবে বোঝা যায় না। মানুষের সীমাহীন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝতে হয়। নিরন্তর বদলে যেতে থাকা পার্টির সভ্যোয়ার

নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে খোলা চোখে খোলা মনে সমস্ত কিছুকে দেখতে ও অনুভব করতে চেয়েছেন তিনি। তাই তাঁর রাজনৈতিক গল্পগুলিতে আছে নানা টানাপোড়েন, যা অনেকের কাছে সমর্থনযোগ্য বলে বিবেচিত হয় নি। আশির দশকে রচিত 'স্বধর্ম' ('বারোমাস', শারদীয় ৮১) গল্পটিতে ঐ ধরণের রাজনৈতিক টানাপোড়েনের পরিচয় পাওয়া যায়।

একদা একনিষ্ঠ স্যাডিয়ান তাত্ত্বিক পার্টিকর্মী লোকনাথ তার মূলতম স্বধর্ম আবিষ্কার করল, পার্টিজগতের বাইরে বৃহত্তর বাস্তব-জগতের অবহেলিত মানুষজনদের মাঝখানে। পার্টি নির্দেশিত নীতি নিয়ম ছাপিয়ে মতাদর্শের মানব মর্যাদা সারা পায় না, সেই সব অসহায় মানুষদের জন্য কিছু করবার চেষ্টায় লোকনাথ তার স্ত্রী বিদ্যা এবং পার্টিকর্মীদের কাছে ধিক্কৃত হয়। লোকনাথের পূর্ব বিশ্বাসের পরিবর্তন হয়। আত্মার বিশ্বাস, শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান এসব লৌকিক আচারের প্রতি আগে তার বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু এখন সে বিশ্বাস করে। লোকনাথের ক্রিয়াকলাপ পার্টিকর্মীদের কাছে অদ্ভুত লাগে যে লোকনাথ মায়ের পিণ্ডদান করতে গয়ায় যায় এবং মাথা মুড়িয়ে আসে, সেই-ই আবার ভোমরের শ্রাদ্ধযাত্রায় অংশ নিয়ে তাদের সঙ্গে মদ্যপান করে আসে। ধর্ষিতা ষোলো বছরের মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে দুষ্কৃতকারীদের হাতে লোকনাথ প্রাণ দেয়। মতাদর্শের ওপর তলার শুদ্ধ শিক্ষিত শ্রেণীর মানসিকতা ও স্বার্থ যে কোনো ভাগ সময় সুবিধাবাদ ও চালাকির নামান্তর লোকনাথের মতো দু'একজন পার্টিকর্মী চরিত্র তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। কী পার্টি, কী পার্টির বাইরে যেখানে লোকনাথ মনুষ্যত্বের অবমাননা দেখেছে সেখানেই প্রতিবাদ করেছে। রাজনৈতিক দলের বিধান বা সুবিধাবাদী সামাজিক নৈতিকতা মেনে মনুষ্যত্বের শুদ্ধতা বজায় রাখা যায় কি না—এ প্রশ্নই 'স্বধর্ম' গল্পে বার বার ফিরে ফিরে আসে।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে সমরেশ বসুর মানসিকতায় এক গুরুতর পরিবর্তন আসে। তাঁর মনে হতে থাকে, যাঁরা নেতার ভূমিকা থেকে, নির্দেশ দিয়ে জীবন চেনাতে চাইছেন তাঁদের অভিজ্ঞতার পরিসর অত্যন্ত সংকীর্ণ। গভীরতর জীবনদর্শনের অবস্থান থেকে ব্যক্তিসত্তার শুদ্ধতর পরিচয় উন্মোচনের গরজে তিনি লিখলেন এক অসাধারণ রাজনৈতিক গল্প 'স্বীকারোক্তি।'

'স্বীকারোক্তি' গল্পের বিষয়, জেলার অ্যাকশন কমিটির নেতা

মিহিরের ব্যক্তিগত বিরোধের কারণে ঐ পার্টিরই একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক, বিশ্বাসী, সৎ পার্টিজান ধ্রুবকে পার্টি থেকে বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে পার্টি কর্মী অনল তার গোপন আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে। কেননা ধ্রুব ছিল আণ্ডারগ্রাউণ্ড কর্মী। পার্টি থেকে বিতাড়িত হলে সে সহজেই পুলিশের হাতে ধরা পড়বে। পার্টি বিরোধী কাজের জন্য স্থানীয় অ্যাকশন কমিটি অনলের কাছে কৈফিয়ৎ চায়। কিন্তু অনল ধ্রুবকে আশ্রয় দেওয়ার কথা স্বীকার করে না। কেননা অনল সৎ, বিশ্বাসী ধ্রুবকে চেনে, কিন্তু ওপর থেকে এলাকায় চাপিয়ে দেওয়া মিহিরকে জানে না। তাই ধ্রুবকে বাঁচানো জরুরী। তার মনে হয় এই অ্যাকশন কমিটির কাছে বিশ্বস্ত থাকা বিবেকহীন দাস মনোবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। তাই প্রেমিকা নীরা সত্য খবর ফাঁস করে দিলেও অনল তা স্বীকার করে না। আবার এই অনলই পুলিশের কাছে ধরা পড়ে তুঁষে ইন্‌ভেস্টিগেটরের হাজার প্রশ্নেও পার্টি সম্পর্কে সব কথাই অস্বীকার করে। হাজার হাজার নির্যাতনেও বিশ্বাস ভঙ্গ করে না। পার্টি ব্যবস্থার সঙ্গে পার্টি কর্মীর এই ব্যক্তিগত টানাপোড়েন অনেকটা যেন নিয়তির মতো। একে ঠেকাবার কোনো উপায় নেই। কম্যুনিস্ট পার্টির একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে সমরেশ বসুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করা যায় না। তার মনে হয়েছিল যে পার্টি সিস্টেমের নিগড়বদ্ধ নিয়মে অনেক সময় মনুষ্যত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠে।

সমরেশ বসু রাজনৈতিক মানসিকতার প্রেরণায় গল্পের বিষয় নির্বাচনে শুধু ছক বাঁধা সংগ্রামের সন্ধান করেন নি। পঞ্চাশের দশক থেকেই তাঁর গল্পের বিষয়ে বিস্তার আসে, যদিও তাঁর 'আদাব' গল্পের প্রাসঙ্গিকতা এখনও প্রবলভাবেই রয়েছে। 'প্রতিরোধ' এর কৃষকদের জোট বাঁধার আন্দোলন, 'জলসায়' শ্রমিক সচেতনতা, 'ধূলি মুঠি কাদড়' এ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংগ্রাম, 'লড়াই', 'এস্‌মালগার' 'পাড়ি' গল্পে সমসাময়িক রাজনৈতিক ছায়া পড়েছে।

বাংলা রাজনৈতিক গল্পের ধারায় সমরেশ বসুর গল্পসমূহে একদিকে যেমন দেশীয় রাজনীতির একটি বিশেষ পর্বের সমস্যা ও সংকট বিবৃত হয়ে আছে, তেমনি অন্যদিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিলতা ও বিপত্তি প্রতিফলিত হয়েছে। পার্টিতন্ত্রের নিপীড়ন এবং

আত্মকথনের পদ্ধতি ক্রমেই যেমন তাঁর কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল, তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াও তেমনি তীব্রতা লাভ করেছিল। কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে লক্ষ্যে পৌঁছানোর কথা সেখানে পৌঁছাতে বাধা বিপত্তি অনেক। এজন্য দায়ী অনেকটাই পার্টির গঠন, পরিচালন পদ্ধতি এবং মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব। কিন্তু কমিউনিস্ট আন্দোলন যাদের নিয়ে, অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষের দল, তাদের ভূমিকা ইতিবাচক। সমরেশ বসু তাঁর রাজনীতি নির্ভর ছোট গল্পগুলিতে এই সত্যে পৌঁছতে চেয়েছেন। এ ব্যাপারে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন। চিত্রিত চরিত্রগুলি তাঁর পরিচিত। পরিবেশ পরিস্থিতি তাঁর নখদর্পণে। তাই দীরেন, ধ্রুব, লোকেশ পাত্র, বেচন, রতন ইত্যাদি চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। চরিত্রগুলির কেউই সর্বহারা নয়। সর্বহারা দলের কর্মসূচি তৈরী এবং রূপায়ণে নিয়োজিত। বাংলা রাজনৈতিক গল্পধারায় এই ধরণের চরিত্র সৃষ্টি করে সমরেশ বসু বাংলা ছোটো গল্পের প্রেক্ষাপটে একটি নূতন মাত্রা যোগ করেছেন।

চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সমরেশ বসু দু'শোর বেশি গল্প লিখেছেন। বিচিত্র সেই ছোটগল্পের বিষয়। একদিকে যেমন লিখেছেন গোয়েন্দা কাহিনী বা ডিটেকটিভ গল্প, কিশোর কাহিনী, অপরদিকে লিখেছেন সমাজের অবক্ষয়ের মানুষদের বিচিত্র জীবনযাপন প্রণালী, উচ্চবিত্তদের নৈতিক অধঃপতনের কাহিনী, বলিষ্ঠ জীবনাবেগ, বিকৃতিহীন যৌনজীবন, নরনারীর বিচিত্র মানবিকতা এবং অবশ্যই রাজনৈতিক প্রসঙ্গ। স্বল্প পরিসরে সমরেশ বসুর সমস্ত রাজনৈতিক গল্পগুলির বিশ্লেষণ ও পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। সমরেশ বসুর গল্পের সম্পর্কে শেষ কথা বলার সময় এখনও আসে নি। তবু সমকালীন লেখকদের কীর্তি স্মরণে রেখে বলতে হয়, শুধুমাত্র রাজনৈতিক গল্পগুলির মধ্য দিয়েই বাংলা ছোটো গল্পের ইতিহাসে তিনি একাই একটি অধ্যায় রচনা করে গেছেন।

———

খুকুড়দহ ১২নং গ্রাম পঞ্চায়েত
দাসপুর ২নং পঞ্চায়েত সমিতি
মেদিনীপুর

শিক্ষা ভিক্ষা নয়
এটি একটি জন্মগত অধিকার।

এই অধিকারকে বাস্তবায়িত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে খুকুড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েত। এই পঞ্চায়েত এলাকায় ৯টি P. L. C. সেন্টার আছে। প্রতিটি সেন্টার চালু আছে। পড়ুয়াদের বহুবিধ সমস্যা থাকলেও লেখাপড়ার প্রতি তাদের অসীম আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। ৫টি P. L. C. সেন্টার জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সার্বিকভাবে খুকুড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েত নিরক্ষরতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে প্রভূত সাফল্য অর্জন করে দাসপুর ২নং পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আগামী দিনে জনগণের সহযোগিতা পেলে আমরা অবশ্যই সফল হব।

অভিনন্দনসহ—

দিবাকর সামন্ত
সচিব
১২নং খুকুড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েত

মদনমোহন রাউৎ
প্রধান
১২নং খুকুড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েত।

শহীদের রক্ত

দেবল বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃদুল রায় পরোপকারী। মফঃস্বল শহরের শুধু তার নিজের পাড়ায় নয়, পাড়ার বাইরের অনেকেরই মুস্কিল আসান সে। ইংরেজীতে 'ফিলানথ্রপিষ্ট' বললে হয়তো একটু ভালো শোনাত, কিন্তু তাকে এই সুযোগে যে ভাবে ব্যবহার করা হয় তা দেখে বড় বেশী এক তরফা। ছেলেবেলার কোন্ এক অশুভ লগ্নে হয়তো অন্যের দাঁড়ায় করে দেওয়া বা বেশন তুলে দেওয়া থেকে যা শুরু হয়েছিল, আজ তা নিয়তির চরকী পাকের মত ঘুরিয়ে ছাড়ছে।

—'মৃদুল—বাবা একটা ডাক্তার ডেকে আনবে এই করে!'

—'মৃদুল দা, আমি কলেজে ভর্ত্তি হব। বাবা বলেছেন তোমার সঙ্গে যেতে।'

—'মৃদুল,— চাদপাড়ালে অবনী খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে রক্ত দরকার। তোকেই দায়িত্বটা নিতে হবে।'

—'দাদা মৃদুল, রীণার অনেকদিন খবর পাচ্ছি না, চলো তো মানসে স্টেশন। খবরটা নিয়ে আয় না চট্ করে।'

এমনি অনেক দায়িত্বের সঙ্গে মৃদুলের দায়িত্ব আছে পাড়ার যে কোন মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করা, কারখানের শিল্পী এনে দেওয়া থেকে শুরু করে এমন কী পাড়ার কোন বৌদির সিনেমার টিকিটটিও কেটে দেওয়া। আর এসব ব্যাপারে সদা হাস্যময় মৃদুলকে বলতে কেউই দ্বিধা বোধ করে না আজো। মৃদুলেরও বাইশ বছরের টগবগে যৌবনে এটা এক সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবেই ধরা পড়েছে।

সেবার মৃদুলের এম. এ. পরীক্ষা। পাড়ার ছেলে এবং ওর সহপাঠী কুনাল এসে বললে, —'মৃদুল আগামী কাল আমার বোনকে দেখতে আসবে। আমার তো পরীক্ষার পড়া আছে। তাই তুই-ই বাড়ীতে যা যা করণীয় একটু দেখিস্। বাবাও তাই চায়।' মৃদুলের পরীক্ষায় মন পাওয়াটা কুনালের মাথাতেও আসে না। আর এটাই যেন স্বাভাবিক।

পরোপকারের মধ্য দিয়েও মৃদুল কেমন করে যেন সেবাপাড়ার সুযোগ

করে নিয়েছে। আইসারি নম্বর না পেলেও অবশীলায় তার এম. এ. পাশ করা হয়েছে। আর তার শিক্ষার প্রসার ঘটার জন্য তার পরোপকারের দৌড়াদৌড়ি কলকাতার পরিধিতেও বিস্তৃত হয়েছে। এমন কি এখন অনেকে কলকাতার কাজে মৃদুলকে পাঠালে তার ট্রেন-বাস ভাড়াও হাতে দেন না! —'এতো সে একটু বাড়তি পরিশ্রম করবে মাত্র। কলকাতায় তাকে তো যেতেই হ'ত।'

এই ছিল মৃদুলের কাহিনী। এ কাহিনী এ ভাবে চললেও হয়তো বা মৃদুল কিছুদিনের মধ্যেই চাকরী পেত। হয়তো তারপর বিয়ে করে সংসারী হত। হয়তো বা নিজের কাজের তাগিদ ওকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তুলত এবং অন্যান্য জ্ঞানী মধ্যবিত্তের মত তার নবীন কাব্য শেষ করবার ক্ষমতা অর্জন করত। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক এরকম ঘটল না।

সেদিন হঠাৎ মৃদুলের মা মাথাঘুরে পড়ে গেলেন। বাবা অফিসে গিয়েছেন। মায়ের অবস্থা ভাল নয়। পড়েই অজ্ঞান, প্রচণ্ড ঘাম। মৃদুল আশে পাশের এক জনের বাড়ীতে দৌড়াল। এখনই ডাক্তার ডাকা দরকার। মায়ের কাছে কারও বসারও দরকার। কিন্তু মানুষ বড় ব্যস্ত। প্রত্যেকেই হাসিত, কিন্তু নিরুপায়। বড় জরুরী কাজে আটকে গেছেন। অন্য কাউকে নিশ্চই পাবে মৃদুল এই আশা প্রত্যেকেরই।

শুটি দুই বাচ্চা ছেলেকে মায়ের কাছে বসিয়ে মৃদুল দৌড়াল ডাক্তারের কাছে। উদভ্রান্ত হয়ে রাস্তা দিয়ে দৌড়াতে গিয়ে সে হয়ে পড়ল পরিবেশ নিরপেক্ষ। তা না হলে দুই রাজনৈতিক দলের বোমাবাজীর ঠিক মাঝখানে সে হঠাৎ এসে পড়বে কেন! আর এতগুলো বোমের শব্দই বা তার কানে ঢুকবে না কেন! তার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া পুলিশের জিপটাই বা তার নজরে পড়বে না কেন! তাই পুলিশের গুলি বা কোন রাজনৈতিক দলের বোমে অথবা দুটোই তাকে করে তোলে প্রাণহীন। নিমেষে জনহীন রাস্তায় তার লাল রক্ত জমাট বাঁধে। কালো হয়। 'কেন' প্রশ্নের পরস্পর বিরোধী উত্তর তৈরী হলেও মৃদুল 'শহীদে'র আখ্যা পায়।

মৃদুল ফেলে যেতে পারে না:

তার মা বিনা ডাক্তারেই সুস্থ হয়ে ওঠেন। মৃদুলের মৃত্যুর খবরে শোকে পাথর হলেও বেঁচে থাকেন।

রাস্তার উভয় পাশে তিন তিনটে শহীদ বেদী তৈরী হয় মৃদুলের স্মৃতিতে। মৃদুলের রাজনৈতিক জীবনের ধারীদের তিনটে দলই।

শহীদের রক্ত—হবে না কো ব্যর্থ' এই শ্লোগানে তিনটে দলের মুখোমুখি সংঘর্ষ বাধে। প্রতি দলেরই দাবী, অন্য দুই দলের শহীদ বেদী বানানোর অধিকারই নেই।

পাতার এবং মুহুলের সংস্পর্শে আসা সব লোকই 'আহা বলেন।

অচিরেই তিনটে দলের কর্মকুশলতায় তিনটে শহীদ বেদীই পড়ে মুখ থুবড়ে। এর ওপরে ভাষণ এবং পাল্টা ভাষণের চড়াই উৎরাই পার হয়ে সার্থক বন্দ্ পালিত হয়।

রাস্তার জমাট বাঁধা রক্ত পীচের সঙ্গে মুহুলের মায়ের দীর্ঘশ্বাস তাঁর শাড়ীর সঙ্গে ক্রমশঃ বিলীন হতে থাকে। সময় গড়ায়।

নিয়মিত প্রকাশ পাচ্ছে—
একটি সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

শব্দের মিছিল

উদ্যোগ :

প. ব. গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ
মেদিনীপুর জেলা কমিটি

কার্যালয় [] মেদিনীপুর

পড়ুন [] সংগ্রহ করুন [] বিজ্ঞাপন দিন।

শারদ শুভেচ্ছা জানাই—

অনির্বাণ পাল
দেবাঙ্গন পাল

প্রযত্নে : শ্রীরাধারমণ পাল

মুকুন্দপুর ঃ বালকরাউৎ ঃ মেদিনীপুর

আনন্দময়ীর আগমণে সবার মন আনন্দে ভরে উঠুক :

প্রবীর সামন্ত
প্রণয় সামন্ত
পারমিতা সামন্ত

প্রযত্নে : শ্রীশঙ্কানন্দ সামন্ত

সহ-শিক্ষক

খুকুড়দহ আই. সি. এম. এম. হাইস্কুল

খুকুড়দহ ঃ মেদিনীপুর

বিষ্ণু দে'র কবিতায় রবীন্দ্র উত্তরাধিকার

হরগোবিন্দ দোলই

"সম্মুখে পাকুন বসি পদ রুদ্ধি রবীন্দ্র ঠাকুর।"—কবি অচিন্ত্য-কুমারের এই পঙ্‌ক্তির মধ্যেই আছে 'কল্লোল', 'কালি কলম' 'প্রগতি'র রবীন্দ্র-বিরোধিতার সুরমর্মটি। বস্তুতঃ এ সুর যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত'র প্যারডি-ধর্মী বিরোধিতা বা মোহিতলাল মজুমদারের 'স্বর গরল' ও নয়, বা তমল ও তা নয়, যে সবকলের মতো চেঁচে বলা—"মাথার উপর জ্বলিছেন রবি হয়েছে সোনার মত ছেলে।" কল্লোলের যে বিদ্রোহ, রবীন্দ্র ঐতিহ্য বা রবীন্দ্র-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ তা শুধুমাত্র বিষয়কেন্দ্রিক ছিল বলা যায়ে না। আঙ্গিক স্তরেও এই বিদ্রোহ অন্তরের মতো লাগে প্রয়াসী ছিল। ফলে ঐতিহ্যান্বেষী প্রবন্ধকার কল্লোল-কবিদের কুলায়-প্রত্যাশী পাখির মতো কখন ফিরতে পারে নি। ব্যাপক ও প্রায় সামগ্রিকভাবে রবি-রশ্মি মালার মাঝে আরও এক স্বতন্ত্র নির্মাণে আপন-মহিমায় ভাস্বর আছে—এই কথা কাহিনী 'কল্লোল' সরণে সবলে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে যা আজকের কবিতার প্রায় অনুসৃত ধারা। কিন্তু সৌরমণ্ডল রবি-রশ্মির তাপ ও আলোতে আপন অস্তিত্ব মুছে ফেলেনি এমন বলা যায়ে না বরং রবি-কর তাদের স্নিগ্ধ দ্যুতি ও তপ্ত প্রভায় পরিণত করেছে এমনটাই বোধহয় বেশি করে সত্য। বস্তুতঃ যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে কল্লোলের স্বতন্ত্রতা তার অধিকাংশ রবীন্দ্র-বীথিতে—পরে-বিপরে গাঙ্গানো। কবি বিষ্ণু দে'র কবিতায় সেই রবীন্দ্র ঐতিহ্য-স্বীকরণের স্বরূপটি বিশ্লেষণ করলেই আমরা তা অনুভব করতে পারি।

ইউরোপীয় সাহিত্য আন্দোলন ও তার ধারায় বাঙলা কবিতাকে যৌবন দান করা যদি সাম্প্রতিক কবিতার উৎস মন্ত্রের সাধারণ লক্ষণ হয়—তবে বিষ্ণু দে'র কবিতায় সর্বব্যাপক আন্তর্জাতিক 'ইমেজ' ব্যবহারে—সে কথা সর্বাধিক সত্য। যদিও সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় প্রাচ্য সংস্কৃতির সার্থক সমন্বয়-এর তিনিই পথিকৃৎ—অন্ততঃ চিত্রকল্প ব্যবহারের অধিক প্রয়াসে। একই সঙ্গে সাম্প্রতিক বাঙলা কবিতার অস্তিবাদী

চেতনার রূপকারও তিনি। এই জীবন দর্শনের মানসিক বহিঃপ্রকাশে রবীন্দ্রনাথের পূর্বাধিকারীত্বের স্বীকৃতিতে তিনি যেমন মুক্ত কণ্ঠ তেমনি স্ব-পথ নির্মাণে নির্মোহ রবীন্দ্রাতিগ পথের পথিক। তবুও ঐতিহ্য-চেতনার কালধর্মে উভয়ের যাত্রাপথের ত্রিবেণী সঙ্গম আপাত-বিস্ময়কর মনে হলেও অন্তরঙ্গে তা সাম্প্রতিকতম বাঙলা কবিতার সংযোগ সেতু এবং দিক নির্দেশক ধর্মও বটে।

প্রেম, প্রকৃতি, আধ্যাত্মিকতার বৃত্তে স্বয়ংসিদ্ধ রবীন্দ্রনাথ যুগসংকটের রূপ প্রত্যক্ষ করে শান্তির ললিত বাণীর স্বস্ত্যয়নে সীমাবদ্ধ হননি। তখন উদয়ে আপন মহিমাকে ক্ষয় করেও তিনি দানবদের সঙ্গে সংগ্রামের তরে প্রস্তুত সৈনিকদের আহ্বান করেছেন। এখানে তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা—মাটির কাছাকাছি কবিদের প্রতিই। যা স্থবির, যা পুরাতন আনন্দহারা তাকে ধ্বংস করতে কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয় আহ্বান মন্ত্র—

"ভাঙো বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও বাঁধ ভেঙে দাও।
বন্দী প্রাণ মন হোক উধাও

জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক……"

"শুষ্ক তাদের দৈত্যপুরে দ্বার ভাঙবে বলে
রাজপুত্র কোথা হতে হঠাৎ এলে চলে।"

এই সূত্রেই মনে পড়ে বিষ্ণু দে'র কবিতায় বিশ্ব-বিজয়ী দৃপ্ত ষোড়সওয়ারকে। যাকে আহ্বান করেন বিষ্ণু দে চোরা বালি'র বুকে সৃষ্টির প্রত্যাশা জাগানোর জন্যে—

"হালকা হাওয়ায় বল্লম উঁচু ধরো
সাত সমুদ্র চৌদ্দ নদীর পার—
হালকা হাওয়ায় হৃদয় দু'হাতে ভরো
হঠকারিতায় ভেঙে দাও ভীরু ধার।"

সমগ্র বিশ্বে, প্রচলিত সমাজের মানবের অবমাননা অবসানে পথনির্দেশ হয়তো দুজনের ভিন্ন তবুও বিষ্ণু দে এবং রবীন্দ্রনাথের সেই 'যুগ-সংকট'-এর স্বরূপ বিশ্লেষণ আশ্চর্যজনক ভাবে একই রকম প্রায়। 'সভ্যতার সংকটে' কবি যেমন উগ্র জাতীয়তাবাদের সংকটকে প্রত্যক্ষ করে আন্তর্জাতিকতায় তার সমাধান খুঁজেছেন, তেমন বিষ্ণু দে'ও

সমাজতান্ত্রিক সাংস্কৃতিকতায় তার সমাধান দেখতে চেয়েছেন।

প্রেম চেতনায় রবীন্দ্রনাথের মানসসুন্দরী যত পর পরিক্রমার শেষে কুণার প্রত্যাশী মুগ্ধা নায়িকা। সে

"……সন্ধ্যার কনক বর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল : উষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা ; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার তলতল ছলছলে
ললিত যৌবনখানি……"

তাকেও কবি কিন্তু অধরা 'প্লেটোনিক লাভ'-এর বিষয় ভেবে দেহাতীত ধ্যানমগ্নতায় রুদ্ধ হন নি। সেখানে কবির কথা "মিলিবে মানব গৃহে নারীরূপ লবে……।" বিষ্ণু দে'র নায়িকা প্রেম চেতনা সমাজ চেতনা, বিপ্লব চেতনার সঙ্গে একাকার। সে তীব্রতার স্বাদ ভাঙা সৃষ্টি নিপুণ এক নায়ক চায়। সরকারের নায়িকার সেই যৌবনের চিরন্তনী স্বপ্ন।

রবীন্দ্রনাথের 'অনাত্মচেতনা' উপনিষদিক তত্ত্বের আধারে নির্মিত। 'বিশ্বদেবের এক থেকে বহু হওয়ার মধ্যে যে একত্বের প্রার্থনায় নিরত অমৃতের পুত্র মানুষ, তাদের স্ব-চেতনার মানবিকত্বের ঐক্যই কবির অন্বিষ্ট। এই ক্ষেত্রে বিষ্ণুদেও এক সমশ্রেণীর মানব সমাজ কল্পনা করেছেন। সেখানে মানুষের, সব মানুষের অনন্ত সম্ভাবনা। ঈশ্বর সেখানে অবান্তর। দুজনের প্রায় একই বক্তব্য ঈশ্বর নয়— "নমি নর দেবতারে।"

প্রকৃতি চেতনায় রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক যুগের মন্ত্রত্বে বিশ্বাসী হলেও যেমন রূপান্তরে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ও প্রকৃতিকে দেখেছেন সেখানে বিষ্ণুদেও প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগের হার্দিক কল্পনাকে বাদ দিয়ে যান্ত্রিক বস্তুতন্ত্রতা চান নি—

"সে শুক এ হৃদয়, তুমি যে শুকমূলে
বসেছ ফুল সাজে, ছায়ায় দাও বাস।"

(ভিলানেল)

এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ আরও একটু পুলকিত—

"ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে।"

সমকালীন সাহিত্য-আন্দোলনগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে'র সংযোগ ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। অবশ্যম্ভাবী একটি ব্যাপার। অনেকে

আলোচনা করেন, রবীন্দ্রনাথ শেলী, কীটস্, বায়রনের জগতের বিবরণ করেছেন কিন্তু টি. এস এলিয়ট, ইয়েটস, পাউণ্ড যে রবীন্দ্র মানসে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তা রবীন্দ্রনাথ অনূদিত এলিয়টের (প্রেলিউড) অনুবাদ কবিতাগুলি দেখলেই বোঝা যায়। 'মডার্নিজমে'র ধারণায় হয়তো মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু আধুনিক প্রবণতার প্রতি উভয় কবিরই ছিল সহানুভূতি।

প্রকৃত পক্ষে এসব আলোচনা শুরু হয়ে যায় যখন এলিয়টের বক্তব্য আমরা স্মরণ করি—

"No poet, no artist of any art, has his complete meaning alone. His significance his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artists, you cannot value him alone: you must set him, for contrast and comparison, among the dead"—"Tradition and the individual talent." এই মহৎ কবির আদর্শ থেকেই বিষ্ণু দে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ-বর্জন করেছেন—উপাদান হিসাবে তাঁর রবীন্দ্র ঐতিহ্য আত্মসাৎ করার ক্ষমতাও বিস্ময়কর। এ বিষয়ে তাঁর অকপট স্বীকৃতি—

> "রবীন্দ্র ব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে
> চিরস্থায়ী ভটজালে জাহ্নবীকে বাঁধিনা, বরং
> আমরা প্রাণের গঙ্গা সোনা রাশি, গানে গানে নেমে
> সমুদ্রের দিকে চলি, খুলে দিই বেগ আর রঙ
> সবাই নতুন চিত্রে গল্পে কাব্যে হাজার ছন্দের
> রুদ্ধ উৎসব ভেঙে পাই পরস্রোত নব আনন্দের
>
> ২৫শে বৈশাখ / নাম রেখেছি কোমল গান্ধার

বিষয় এবং কাব্য প্রবণতায় দুই কবির মানসিক সাধর্ম্য লক্ষ্য করা গেল। কবিতার রূপাঙ্গিকের ক্ষেত্রেও এই নৈকট্য অস্পষ্ট থাকে না।

রবীন্দ্র কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলি ভেঙে ভেঙে নতুন 'ডাইমেনশন' তৈরী করতে বিষ্ণু দে'র যেন জুড়ি নেই। যাকে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন 'ব্যবস্থাগুরুতি' সেই রবীন্দ্রানুসরণের মধ্যেই আমরা দেখতে পাব, রবীন্দ্রনাথ কতখানি বিরোধীদেরও মনের এবং প্রাণের বিষয়। দেশজ ঐতিহ্যের সন্ধানে দুজনেই কতখানি লোক জীবনের দিকচক্রে যেতে লক্ষ্যাভিমুখী

ভ্য: ঋ: শ্যামল—

"নীল নবঘনে গগনে সেই
আঁধার পরাণ, বৃষ্টি ঝরে"

"বন্ধনহীন পথ, বেঁধে দেয় গ্রন্থি
ছিন্ন কথা দলেই ভেঙে সামন্ত"

"তোমাকে দেখেছি হে ভোজরাজের সভায়
পুতুল আমার রঞ্জনা
গ্রামছাড়া পথে
ঘাঙা মাটি কাদা
গোষ্পদ নদী অঞ্জনা"

কবিতায় টেকনিক সর্বাপেক্ষা যেমন রবীন্দ্রনাথ বা বিষ্ণু দে'র-ই কাম্য নয় তেমনি আঙ্গিক ও বিষয় দুইয়ের পার্বতী-পরমেশ্বর মিলনের জন্য আপন মুখী-মুখ সাধনায় কেউই কম সক্রিয় নয়। নৈর্ব্যক্তি সাধনার সাধ কারুরই নয়, রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রকল্প' গুলির মধ্যে সমুদ্র ও নদীর প্রিয়তা বিষ্ণুদেরও সহজ লভ্য। এজরা পাউণ্ড কথিত কবিতা-ধর্মের ত্রয়ী—melopeia, phanopeia, logepeio-র সাক্ষাৎ রবীন্দ্র-নাথ ও বিষ্ণু দে উভয়েরই হৃদ্‌গত ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পুনশ্চ' পরবর্তী কাব্যে যে কথারীতির প্রয়োগ এবং গদ্যছন্দের ব্যবহার শুরু করেছিলেন তা শুধু বিষ্ণু দে কেন এখনও পর্যন্ত সাম্প্রতিক কবিদের অনুসৃত পথ হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার চাইতে গানগুলিতে নানা দেশের মিউজিক সিম্ফনিকে যে ভাবে ব্যবহার করেছেন ঠিক সেই ভাবেই বিষ্ণু দে তাঁর কবিতায় অবলীলা ক্রমে বেঠোফেন, মোজার্ট এর সিম্ফনি ব্যবহার করেছেন। সেখানে ঘটেছে ধ্বনিরীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ, কথ্য ভাষার ইডিয়মগুলির সার্থক ভাবে ব্যবহার। নতুন তাৎপর্য পূর্ণ শব্দানুষঙ্গ তৈরী (মেদুর বাস, ভরতী সন্ধ্যা) বিষ্ণু দে'র নিজস্বতার পরিচায়ক।

ধ্বনিপ্রধান মাত্রাধৃত ছন্দেই বিষ্ণু দে'র প্রতিভা সমধিক বিকশিত। আর এই ছন্দের প্রথম প্রধান রূপকার রবীন্দ্রনাথ নিজে। যে ধারণা প্রচলিত ছিল যে, এ ছন্দ রোমান্টিক ভাব কবিতারই যথার্থ মাধ্যম; যে ধারণা বিষ্ণু দে বদলে দিয়েছেন। আধুনিক কবির—"objective correlative" ও নৈর্ব্যক্তিক মনোভঙ্গিকে বিষ্ণু দে এই

ছন্দের ব্যাপারেই সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন। এছাড়া ভিলানেল, সেসটিনা, সনেট প্রভৃতি বিদেশী ছন্দ তো কবির করতলগত ছিলই। ইন্টারন্যাশনাল রাইমের প্রভাবও কবি বিষ্ণু দে'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে করিয়ে দেয়।—

"ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাহি;
হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি "

—রবীন্দ্রনাথ

"অতএব মেসে কাটাও ভক্তাপোষে
দৈনিক দেশে কাজ খালি খোঁজা কষে,
পেলায় মেশায় তীব্র ভাতের মাঠ চষে
আর দেখ বসে সিনেমার পোষ্টার
এলিয়ট পলে তারপর লোনো বসে
পেলো ইতিহাসে নানা ঘাটে উদ্ধার।"

– বিষ্ণু দে

পরিশেষে এ কথাই বলতে হয় যে, প্রথম সূত্রে আমরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিষ্ণুদে'র মিল খুঁজে পাই তা হলো অস্তি চেতনা। আধুনিক কালের সবচেয়ে বড়ো ট্রাজেডী অবসাদ, বিশ্বস্ততা, ক্লান্তি, চরম শান্তি। সেই পিরিয়ড অব্ ডেকাডেন্স থেকে রবীন্দ্রনাথ আমাদের উদ্ধার করে স্থিত করতে চেয়েছিলেন মহাবোধির জগতে। বিষ্ণু দে তাকে নামিয়ে এনেছেন বাস্তবের সমাজ পটে, স্থির লক্ষ্যে। তিনিও আসলে মানবতার বিশ্বাসী। তাই এলিয়টের মতো রেড রকের তলায় আশ্রয় না নিয়ে তিনি গেছেন মানুষের দরবারে, যেখানে আছে বিশ্ববিজয়ী ষোড়সওয়ারের অমর ধ্বনি। মানুষের এতদিনের ক্লেদকে দূর করার প্রতিশ্রুতি আছে। আছে উত্তরাধিকারীদের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবীর প্রতিশ্রুতি। সে প্রতিশ্রুতি রবীন্দ্রনাথের, সে প্রতিশ্রুতি বিষ্ণু দে'রও।

———

আশাপূর্ণার উপন্যাসে নারীব্যক্তিত্ব

[প্রসঙ্গ : প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা, বকুলকথা]

অশোক পাল

আশাপূর্ণা দেবী বাংলা সাহিত্যের মহিলা কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে প্রধান এবং জনপ্রিয় লেখিকা। তাঁর রচনার অন্যতম প্রধান বিষয়—নারী ব্যক্তিত্ব বা নারী স্বাধীনতা। লেখিকা নিজে অন্তঃপুর-বাসিনী হয়েও নারীকে আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

প্রত্যেক লেখকই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অপূর্ণতাকে—সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে পূর্ণ রূপ দিতে চান। আশাপূর্ণার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। লেখিকা ব্যক্তিগত জীবনে সম্পূর্ণতঃ অন্তঃপুরিকা ছিলেন। সেখানে স্বাধীন জীবন কিংবা শিক্ষালাভের কোনো সুযোগই ছিল না। অথচ নারীর স্বাধীন ব্যক্তিত্ব তিনি সর্বদা কল্পনা করেছেন। নারীব্যক্তিত্বের স্বাধীন রূপ তাঁর রচিত তিনটি উপন্যাসের (প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা ও বকুলকথা)—প্রধান তিনটি চরিত্রকে আশ্রয় করে বাস্তবায়িত হয়েছে।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' (১৩৭১), 'সুবর্ণলতা' (১৩৭৩) ও বকুলকথা' (১৩৮০) আশাপূর্ণা দেবীর এই তিনটি উপন্যাস একই সূত্রে গ্রথিত। 'অতীত, অনতি অতীত, বর্তমান ও আগন্ন ভবিষ্যতকে' —এক অনন্য গ্রন্থিতে এই তিনটি গ্রন্থে তিনি গ্রথিত করেছেন। সত্যবতী, সুবর্ণলতা ও বকুল যেন লেখিকার মাতামহী, মাতা এবং স্বয়ং লেখিকা আশাপূর্ণা। লেখিকা এই তিন চরিত্রের তিন বিদ্রোহিনীকে প্রতিনিধি করে তিন যুগের নারীজীবনের তিনটি ভিন্ন রূপকে ফুটিয়েছেন। নারীজনচিত্তের সহজাত আশা-আকাঙ্খা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, পূর্ণতা-অপূর্ণতা, বেদনা-বঞ্চনা ক্ষুব্ধতা-সহিষ্ণুতাকে নিয়ে বাস্তব এবং মনোরম জগৎ সৃষ্টি করতে পেরেছেন। আশাপূর্ণার বিশেষত্ব তাঁর রচনায় নারী-হৃদয়ের কিংবা অন্তঃপুরবাসিনীদের সমস্যার সঙ্গে উত্তরণের প্রয়াসও রয়েছে। সত্যবতী থেকে পাঠক-বকুলের ইতিহাস সেই সংগ্রাম ও উত্তরণের ইতিহাস। "আজকের বাংলাদেশের অজস্র

বকুল-পারুলদের পিছনে রয়েছে অনেক বছরের সংগ্রামের ইতিহাস তারা সংখ্যায় অজস্র ছিল না, তারা অনেকের মধ্যে মাত্র এক একজন। তারা একদা এগিয়েছে। এগিয়েছে পানা-ডোবা ডিঙিয়ে, পাথর ভেঙে, কাঁটা ঝোপ উপড়ে। পথ কাটতে কাটতে হয়তো দিশেহারা হয়েছে, বসে পড়েছে নিজেরই কাটা-পথের পর ছুড়ে। আবার এসেছে আর একজন,.....। এমনি করেই তো তৈরী হল রাস্তা।'..... [প্রথম প্রতিশ্রুতির ভূমিকা]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র ও পুরুষের নর্মসহচরী মাত্র। অন্তঃপুরেই তার নারীজীবনের চরিতার্থতা। অন্ততঃ পুরুষ নারীকে তাই বুঝিয়েছে। আমাদের অন্তঃপুরিকারা মনুষ্যত্বের কিংবা নারীত্বের সম্মান কোনোদিনই পায় নি। দীর্ঘ সংস্কারের বশে তারা তাদের স্বতন্ত্র-মর্যাদার কথা ভাবতেও ভয় পেত। এদের ব্যর্থ জীবনের বেদনাময় সংগুপ্ত ইতিহাস—অবলুপ্তির ইতিহাস। তারা পিতা, পুত্র এবং স্বগোষ্ঠীভুক্ত নারীদের দ্বারা আমরণ শাসিত ও শোষিত হয়েছে। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' অত্যাচারিত নারী সমাজের ইতিবৃত্ত। এই মহাগ্রন্থে নারী শাসনের ইতিহাসের পাশে জাগরণের ইঙ্গিত রয়েছে, রয়েছে পালাবদলের ইতিহাস। একটা নীরব বিপ্লবের কাহিনী। আশাপূর্ণার নিজের ভাষায়, "অন্তঃপুর চিরদিনই অবহেলিত। বাংলা-দেশের সেই অজ্ঞাত অন্তঃপুরের নিভৃতে প্রথমত দ্বার মোচন করে এনেছেন প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর, এ গ্রন্থ সেই অনামী মেয়েদের একজনের কাহিনী।' 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র এই মেয়েটির নাম সত্যবতী। "নাকে নোলক; কানে 'সার' মাকড়ি, পায়ে ঝাঁকের মল, বৃন্দাবনী-ছাপের আটহাতি শাড়ি পরা আট বছরের সত্যবতী। বিয়ে হয়ে গেছে বছরখানেক আগে—এখনও বর-বসত হয় নি। অপ্রতিহত প্রতাপে ছেলেখেয়ের দলনেত্রী হয়ে যথেচ্ছ পেলে বেড়ায়। সত্যবতীর মা-ঠাকুমা-জেঠী-পিসী এঁটে উঠতে পারে না ওকে।" সত্যবতীর সঙ্গে এঁটে উঠতে কেই বা পারে? বাবা রামকালী চাটুজ্যে—সাতপানা গাঁয়ের মাথা—তাঁকেও সত্যর কাছে যুক্তিতে মাঝে-মধ্যে হার মানতে হয়। সত্য প্রতিবাদী-বিদ্রোহিনী। তৎকালীন নারী সমাজে সে বাপছাড়া। আসলে সত্য ভেতরে ভেতরে একটা গোটা মানুষ, বাইরের রূপটাই যা মেয়েমানুষের। তাই রামকালীর মেয়ে, দীনতারিণীর নাতনী, নবকুমারের বৌ, এলোকেশীর পুত্রবধূ সত্যবতী হীন ব্যবস্থায় পীড়িত

হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে কলঙ্কিতও করেছে। গণ্ডী কেটে বাইরে আসতে সক্ষম হয়েছে। কেউ ছিঁড়ে পৃথিবীর মুক্ত আলোয় উদ্ভাসিত করতে চেয়েছে অন্তঃপুরকে। নারীকে সম্মানিত করতে চেয়েছে 'মানুষ' হিসেবে।

সত্যবতী উপন্যাসের 'মেয়ে-নায়ক'। খাপে ঢাকা খাঁটি ইস্পাতের শাণিত তরবারি। কোথাও এতটুকু ঠেকে না। সে শঙ্কর নীলাম্বর বাড়ুজ্যের অবাঞ্ছিত আচরণের জন্য হোক কিংবা জামাইয়ের অসুখের কথা শুনে নিতে না এসে বাবা রামকালীর পাঠানো ওষুধ সেবন দেওয়ার নিষ্কারুণ অবজ্ঞা নবকুমারের চাকুরীর পর কোলকাতায় বাসা ঠিক করে চলে যাওয়া—এ সবই তার স্বাধীনসত্তার পরিচয়। নবকুমারের অসুখ করলে সাহেব ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা, পাঠশালায় পড়ানো, একজন গৃহবধূ হিসেবে সত্যবতীর কত বড় বিপ্লব এযুগে বসে কল্পনা করা যাবে না। তবে সত্যবতীর সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ হোল যখন সুবর্ণলতার বিয়েকে কেন্দ্র করে কাশী চলে যাওয়া। বাল্যবিধবা এক্কেবারেশী পুত্রবধূর প্রতি আক্রোশে গায়ের ঝাল মেটাতে গিয়ে সত্যবতীর অজান্তে নায়িকা নায়কের বিয়ে দিয়ে দেয়। সত্যবতী কোলকাতা থেকে গ্রামে এসে এই বিয়ের কথা জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যাওয়ার জন্য গাড়ীতে উঠে বসে। নবকুমার বাধা দিলে বলে—"সত্যি বলছো? ফিরিয়ে এনে দেবে? এই পৃথুল দেহের বিনিময়ে মরে ফিরিয়ে এনে দেবে আমার সুবর্ণকে?....." সুবর্ণ কাশী চলে যায়। স্বামী নবকুমার অভিশাপের ভয় দেখালে প্রায় হেসেই সত্যবতী বলে—"তাই তো দিয়ে এসেছো তোমরা আদ্যকালকাল থেকে। স্বামী হয়ে, বাপ হয়ে, ভাই হয়ে, ছেলে হয়ে, ওটা নতুন নয়। অভিশাপেরই জীবন আমাদের"। যদিও অভিশাপকে নতমস্তকে মেনে নেওয়ার পাত্রী সত্যবতী নয়। সে আজীবন সংগ্রামী। তাকে আজীবন পথ কাটতে হয়েছে। তবে আমাদের সমাজে সত্যবতীরা খুব বেশী সংখ্যায় আসে নি। সেটা স্বাভাবিকও নয়।

'সুবর্ণলতা' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সুবর্ণলতা। সত্যবতীর মতো 'মেয়ে নায়ক' হওয়ার পুরোপুরি যোগ্যতা সত্যবতী-কন্যা সুবর্ণর চরিত্রে ছিল না। সে সমাজের আর পাঁচটা মেয়ের মতোই নারী স্বাধীনতা মনে মনে লালন করেছে—কিন্তু অবস্থাকে বলবতী করার মানসিক দৃঢ়তা তার ছিল না। তবে একথা ঠিক যে, সত্যবতী

যেমন বাস্তব—সুবর্ণলতাও তেমনি বাস্তব। অধিকাংশ সুবর্ণলতা প্রতিবাদকে অন্তরে সংগুপ্ত রেখে বিদ্রোহকে চোখের জলে ভাসিয়ে ব্যথায় গুমরে গুমরে কেঁদে মরেছে। অবশ্য সত্যবতীর প্রতিবাদ, সুবর্ণলতার স্বাধীনতা প্রাপ্তির সংগুপ্ত আকাঙ্খা—সুবর্ণলতার ছোট মেয়ে বকুলের জীবনে পূর্ণতা পেয়েছে। বকুল বর্ণনা লেখিকা হয়েছে 'অনামিকাদেবী' ছদ্মনামে। বকুল ও বকুলের দিদি পারুলের ইতিকথা 'বকুল কথা'য় কথিত হয়েছে।

'বকুলকথা' একটু ভিন্ন ধরণের উপন্যাস। বকুল আমাদেরই যুগের মেয়ে। যে স্বাধীনতার জন্য সত্যবতীকে দীর্ঘ সংগ্রাম করতে হয়েছে—বকুলকে অনুরূপ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে হয় নি। সত্যবতীর সংগ্রামের ফসল বকুল-পারুলের ভিন্নমাত্রার জীবন। বকুল আর পাঁচটা মেয়ের মতো বিয়ে না করেও সার্থক জীবন-যাপন করেছে। 'বকুল কথা'র আশাপূর্ণা পথ খুঁজেছেন—প্রশ্নের উত্তর পেতে চেয়েছেন। বকুল তথা লেখিকা অনামিকাদেবীর মনে হয়েছে—তাঁর মা-দিদিমার সাফল্য কোথায়? স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচার, নারী প্রগতির নামে বর্তমানের বাভিচারী জীবন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের নামে স্বামীর সংসার ত্যাগ—এরজন্য নিশ্চয়ই সত্যবতী-সুবর্ণলতারা তাদের জীবনকে তিলে তিলে ধূপের মত দহন করেন নি। বকুলের এই প্রশ্ন বকুলের দিদি পারুলেরও সম্ভবতঃ বকুল ও পারুল কতকটা একই ছাঁচে গড়া। অবিবাহিতা বকুল আর বিবাহিতা পারুল যেন একই চরিত্রের দু'টি বাস্তবিক অবয়ব। বকুল-পারুল দু'জনেই অনন্যা—আপন স্বরূপে আপনি ধন্যা। তারা নারী মুক্তির যুগেও নারী মুক্তির পথ খুঁজেছে—স্বেচ্ছাচারিতা নিশ্চয়ই নারী প্রগতির মূল কথা নয়? আমাদের মনে হয়েছে, সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সমাজ-সংসারের বাইরের দিকের যতটা পরিবর্তন হয়েছে—মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিতে ততটা হয় নি। তাছাড়া আমরা বোধ হয় খুব বেশী এগোতেও পারি নি। যেমন বকুলের দিদি পারুলের জীবন। পারুল সুন্দর প্রেমের কবিতা লিখতেন। বকুলের জামাইবাবু অর্থাৎ পারুলের স্বামী অমলের ধারণা ছিল—"ভিতরে ভিতরে একটি 'প্রণয়কাণ্ড' আর গোপন কোনো প্রেমাস্পদ না থাকলে এমন গভীর প্রেমের কবিতা লেখা সম্ভব নয়।" ভদ্রলোক তাই কড়া নজর রাখতেন যাতে না আপন হৃদয়ের জানলা-দরজার খিল ছিটকিনি দিয়ে বাইরের কোনো জঞ্জাল না ঢুকে পড়ে। পারুল কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর পর পারুল কৃতি দুই ছেলের

কাছে না রেখে একাকী স্বামীর বাড়ীতে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য একবার ছোট ছেলে শোভনের কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু শোভনের স্ত্রী রেণা মেনে নিতে পারে নি। কারণ "শোভনের নির্বোধ মা 'সাহেব' ছেলেকে 'সাহেবে'র দৃষ্টিতে না দেখে ছেলের দৃষ্টিতে দেখলেন। শোভনের মা ভাঁড়ার ঘর পুজোর ঘরের দায়ও না মাড়িয়ে ড্রইংরুমে এসে সোফায় বসে খবরের কাগজ পড়তে শুরু করলেন, পলম বুনতে শুরু করলেন। পাকল শোভনের জন্য পলম বুনলেও শোভনের বৌ রেণা তা মানবে কেন? কাজেই আত্মসচেতন পাকলকে চন্দননগরের বাড়ীতে চলে আসার জন্য ছেলেকে বলতে হল।

পাকলের প্রত্যেকটি কাজই বৈপ্লবিক। আর পাঁচটা মেয়ের বৈধব্য জীবন-যাপন না করা, প্রায় অপরিচিতা ভাইঝি শম্পাকে তার অসুস্থ প্রণয়ীসহ আশ্রয় দেওয়া—এই নিয়ে ছেলে মোহনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব—সবই অনুমনীয় তেজ-উদার মানসিকতা এবং আধুনিক মননের পরিচায়ক। মনেরাখতে হবে পাকল-বকুলের প্রতিরূপ, সত্যবতীর সার্থক উত্তরাধিকারিণী। বকুল কথা—পাকলেরও কথা। বকুলের মতো পাকলও ভেবেছে—আধুনিক যুগে নারীকে স্বাধীনতার নামে অনেক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারী করে তুলেছে। বকুলের বড়দার ছেলে অপূর্বর মেয়ে সত্যভামা তথা রুক্মা, সিনেমার নায়িকা নমিতা তথা রূপছন্দার স্বেচ্ছাচারী জীবন-পদ্ধতি কখনই কাম্য হতে পারে না। কারণ এর পরিণতি অত্যন্ত করুণ—এবং সেটাই স্বাভাবিক। সত্যভামা, রূপছন্দা দু'জনেই আত্মহত্যার মধ্যে শান্তি খুঁজে পেয়েছে।

একথাও ঠিক যে, নারী স্বাধীনতা সত্যভামা, সত্যভামার আধুনিক বিকারগ্রস্ত মা অলকা, রূপছন্দার জন্মের পাশাপাশি শম্পার মতো মেয়েদেরও জন্ম দিয়েছে। শম্পা বকুলের দাদার মেয়ে—কলেজে পড়া একালের মেয়ে। প্রেমে পড়া শম্পার প্রধান ছবি। কলকল্ করে কথা বলে। একটা দমকা হাওয়া। মা বাবার অমতে পছন্দমত জীবনসঙ্গী বেছে অনির্দিষ্ট পথে পা বাড়াতে দ্বিধা নেই। স্বাধীনচেতা শম্পা সত্যবতীর তৃতীয় জেনারেশান। নিজের স্বাধীনতার জন্য যে মূল্য সে দিয়েছে, যে বিশ্বাস আর নিষ্ঠার পরিচয় রেখেছে, তাতে আমাদের বারবার সতী দময়ন্তী কিংবা সাবিত্রীর কথা মনে পড়ে।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের মানসিক যন্ত্রণা বাড়ছে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় ব্যক্তিসচেতনতা কিংবা সহনশীলতার অভাবে এই যন্ত্রণা। 'যুগযন্ত্রণা' শব্দটিযদি কোন গোষ্ঠী বিশেষের একচেটিয়া না হয়, তাহলে সব পেয়েও যে কিছুই পেল না সেই পাকলের পুত্রবধূ রেখাও যুগযন্ত্রণারই প্রতীক।" এই যুগের সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হ'ল—'অসহনতা',

'নিরুপায়ত'। সমস্যা সমাধানের পথ আছে উপায় নেই ইচ্ছে আছে কিন্তু পূর্ণতা দেওয়ার অতপ্রোত মানসিক শক্তি নেই। তাই স্বামী-পুত্র ছাড়ার যন্ত্রণা স্বীকার করে নিয়েও আজকের যুগের আক্সসচেতন মেয়েরা তিল তিল করে নিঃশেষ করছে নিজেদের। বকুলের জীবন ? পায়লের জীবন ? অন্ততঃ একালের জীবন সম্পর্কে পায়লের ধারণা বকুলকে লেখা একটি চিঠিতে সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে—"তার মানে কেউ কোথাও এগোয় নি বকুল, এগোচ্ছে না। আমরাও যেখানে ছিলাম, এরাও সেখানেই আছে।" এই যুগ সম্পর্কে বকুলের নিজস্ব মতামত—"আমি যে দেখতে পাই ভয়ঙ্কর প্রগতির হাওয়ার মধ্যেও জায়গায় জায়গায় বন্দী হয়ে আছে চিরকালের দুর্গতির রক্তশ্বাস। দেখতে পাই আজও লক্ষ লক্ষ মেয়ে সেই আলোহীন, বাতাসহীন অবরোধের মধ্যে বাস করছে। এদের বাইরের অবগুণ্ঠন হয়তো মোচন হয়েছে, কিন্তু ভেতরের শৃঙ্খল আজও অটুট"। বকুল আশাবাদী। বকুলের বিশ্বাস, রাতের অন্ধকারে যাযাবরীয় যুগযন্ত্রণা সত্ত্বেও—মানবিক মূল্যবোধ নক্ষত্রের মতোই জ্বলজ্বল করছে। বকুল খুব সুন্দর করে বলেছে—"একদা এই মানুষ জাতটা গুহা থেকে বেরিয়ে পড়ে নানান চেষ্টা শুরু করেছিল, শুধু বেঁচে থাকার চেষ্টা। আর কিছু না শুধু কোনো রকমে নিরুপায় করে বেঁচে থাকা। ক্রমেই দেখল চেষ্টার অসাধ্য কাজ নেই। বড় খুশী হয়ে উঠল। নিজের কৃতিত্বে মোহিত হল, মুগ্ধ হল, অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে চলল। অবশেষে গুহা থেকে চাঁদে উঠল……আরো ছুটছে, উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। টের পাচ্ছে না তাদের চলার পথটা আবার গুহামুখো হয়ে যাচ্ছে! যাবেই। যেতে বাধ্য। পথটা যে বৃত্তপথ। তবুও মানুষ ছুটছে ছুটবে—সামনে এগোচ্ছি বলে ছুটবে"।

আশাপূর্ণার বিশেষত্ব হল, এখানে নারী স্বাধীনতা পুরুষ বিদ্বেষের হাত ধরে আসে নি। আশাপূর্ণা বিশ্বাস করেন—নারী আপন মহিমায়, আপন স্বাতন্ত্রে মহনীয় হয়ে উঠবে। অকারণে পুরুষের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে হয়তো নিজেদের ক্ষমতা আরো বাড়ানো যায়, বড় হওয়া যায় না। নারী ব্যক্তিত্ব নারীর নিজস্ব সম্পদ, সেটা তার অন্তরের ঐশ্বর্য। এই সম্পদ যার আছে তাকে পুরুষের বিরুদ্ধে বেহাদ্দ ঘোষণা করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে করতে হয় না। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ—সত্যবতী, পায়েল, বকুল এবং পায়েলের পুত্রবধূ রেখার জীবনকাহিনী। এই ত্রয়ী উপন্যাস একালীনের অভিনবত্বে এবং লেখিকার স্নিগ্ধ হৃদয় স্পর্শে উজ্জ্বল। তা সম্পূর্ণ ঘরোয়া অথচ চিরন্তন ও একান্ত বাস্তব।

———

পত্রিকা পর্যালোচনা

আলপথ : সম্পাদক : দেবাশিস্ কুইলা : উত্তর বিশ্বনাথপুর, পটাশপুর, মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত। ২য় বর্ষ—২য় সংখ্যা। পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা বাইশ, নয়টি কবিতা, দুটি ছোট গল্প, কৌতুক মকশা নিয়ে সাধারণ সংকলন। আশিস কুমার দে ('ক্লান্ত অন্ধকারে'), হেমন্ত মাইতি ('তোমার হাত ধরে'), রামেশ্বর পাণিগ্রাহী ('রাতের আকাশ ডুবলো জলে') কবিতাগুলি ভালো। রোশনারা মিস্ত্রি'র 'অনুগত' কবিতাটি পত্রিকার উৎকৃষ্ট রচনা। দেবাশিস কুইলার 'তোমাকির আলো' কবিতায় হতাশার ছবি স্পষ্ট গল্পে হরিপদ দাস অধিকারী ('মায়াজাল') পাঠকদের প্রত্যাশা পূর্ণ করতে না পারলেও তপনাব ভাদার 'পণ্য' গল্প পাঠকদের হৃদয় নাড়া দেয়। পত্রিকার ছাপা ও কাগজ মোটামুটি / মূল্য : তিন টাকা।

কাগজের নৌকা : সম্পাদক : সরল বিশ্বাস : উদয়পল্লী, মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত। তের বর্ষ—প্রথম সংখ্যা—মূল্য—দু'টাকা আট পৃষ্ঠার আয়তনের সর্বত্রে আছে অমুদ্রিত অভাব। শৌট পাণিগ্রাহী প্রচ্ছদ 'মা ও ছেলে' সাধারণের চোখে দুর্বোধ্য স্থচীপত্রহীন পত্রিকায় পাঠকরা বিদ্রান্তের কবলে পড়তে অদ্বিতীয় হবেন। তবু বর্তমান সংকলনে সুকোমল বসু, সমরকুমার দাস, মধুসূদন চক্রবর্তীর কবিতা হৃদয়গ্রাহী। দীপঙ্কর দাসের, নক্তলের বিদ্রোহ : একটি মূল্যায়ণ'টি বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে

নীলকণ্ঠ : নির্বাচনসংকলন, সম্পাদক : আশিসকুমার ঘোষ : একুশ বর্ষ : কত সংখ্যা উল্লেখ নাই। মূল্য : পাঁচ টাকা। চবি / ৩৭, সি, আই, টি, বিল্ডিংস, কলিকাতা ১০ থেকে প্রকাশিত। পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। কয়েকটি কবিতা, একটি প্রবন্ধে কবিকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য কবিতাও স্থান পেয়েছে চল্লিশ পৃষ্ঠার মধ্যে। কবিতার মধ্যে গৌতম বাগচি (এবং তারপর), সুব্রত চক্রবর্তী (আমাকে পোড়াও), শ্যামলেন্দু দেবনাথ (পুরুষ), শিবা ঘটক (সাদা ডানা), বিশ্বনাথ ঘোষ (এদিকে), শুভশ্রী ঘটক (প্রজাপতি) কাল্পিক পাত্র (চাঁদ আর

মোমবাতি), মায়া মাইতি (কই কিছু স্মরণযোগ্য) সুদীপ ঘোষ (ওই দুটো জানালা)। প্রবু বন্দ্যোপাধ্যায় (বিন্দু বিসর্গ), গৌর সেন (ঘুমুতে চাই) উল্লেখযোগ্য রচনা। তারাপদ আচার্যের শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'অবনী বাড়ি আছে?' আলোচনা পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছে। সম্পাদকীয়তে লিটিল ম্যাগাজিনের প্রাবন্ধিক অপরিচিত সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে স্মৃতিচারণ সুখপাঠ্য। সূচীপত্রে লেখকের নাম পর পর পৃষ্ঠা অনুযায়ী সাজানো নেই। তবুও ভালো কাগজে 'দ্র' একটি মুদ্রণ প্রমাদে, সাধারণ প্রচ্ছদে ভালো সংকলন।

মুক্তক : বর্ষা সংকলন, কত বর্ষ উল্লেখ নাই। সম্পাদক অমিয় কুমার সেনগুপ্ত, উলবেড়িয়া, তিমুড়ি, হাওড়া থেকে প্রকাশিত। মূল্য—তিন টাকা। পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক। ১৭×১-এর মুক্তক এর বর্ষা সংকলনে আছে ছোটগল্প, একাধিক পাঠকের চিঠি, পাঠকের চোখে কবিতা বিচার, কাব্যগ্রন্থ আলোচনা এবং বারটি কবিতা। কয়েকটি জীবনমুখী ও সামাজিক আবেদনের কবিতার মধ্যে কল্পনা সেন, দীপঙ্কর রায়, দেবপ্রসাদ মিত্র, শক্তি সেনগুপ্ত-এর কবিতা হৃদয় স্পর্শ করে। আর্টপেপারের 'ছাত' গল্প পুনঃমুদ্রিত হলেও গল্পের নায়িকা মুক্তকেশীনা যমুনার সন্তানলাভ চিত্তাকর্ষক। আরো গল্প চাই। সম্পাদকীয় না থাকা পীড়াদায়ক। ছিমছাম সংকলন।

স্বপ্নসন্ধ : সম্পাদক বিজয়চাঁদ ঘোষ : দশম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মে, '৯০। রাধানগর, মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত। মূল্য—তিন টাকা; ষোড়শ প্রচ্ছদে, ছাব্বিশ পৃষ্ঠার মধ্যে তিনটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ, নয়টি দারুন কবিতা, বিজয়চাঁদ ঘোষ এর 'এই দেহ এই মন' ধারাবাহিক উপন্যাস, অরুণ ঘোষের ভক্তিগীতি প্রকাশ পেয়েছে। প্রবন্ধে রোজিনীনাথ মণ্ডল অতীতের গৌরব কাহিনী অবলম্বন করেছেন। ডঃ সুমিত্রা পাত্র 'আলা' গল্প অতি সাধারণ, পাঠকের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ। মাত্রাধিক্য বানান ভুল, মুদ্রণ প্রমাদ পাঠকদের পীড়াদায়ক হলে। তা পত্রিকার গুনমান কমিয়ে দেয়।

ছুটি—ছুটি : মতিবুর রহমান : পাসপামার, রামেশ্বরনগর, হাওড়া থেকে প্রকাশিত। প্রথম বর্ষ—প্রথম সংখ্যা—জুন ৯০, মূল্য—দুই

টাকা। বার্ষিক অতিরিক্ত। পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮৭। প্রচ্ছদে ভবানী প্রসাদ মজুমদার-এর ছুটি সম্পর্কে ছড়া ও ছড়ায় সম্পাদকীয় ভালো লাগবে পাঠকদের। ছড়া পাঠকদের লোভনীয় সংকলন। এই ছড়া সংকলনে ছত্রিশটি ছড়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছড়া লিখেছেন— ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, অমল ত্রিবেদী, তপনকুমার বৈরাগ্য, সনৎকুমার মিত্র, স্বপনকুমার রায়, উদ্ধারপদ বিশ্বাস, গোপাল কোটাল, প্রবীর জানা, রামকিশোর ভট্টাচার্য। সম্পাদক পত্রিকার পৃষ্ঠা বৃদ্ধির জন্য ভাবনের আশা করি, নিভাঁজ হাতসারা এই সংকলনের প্রচ্ছদে চমক নাই।

ছাত্তিমতলা: সম্পাদনা ও প্রকাশনা: ছাত্তিমতলার বন্ধুরা: রাধিকা-বাবু লেন, পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত: মূল্য: চার টাকা। পত্রিকাটি মূলতঃ কবিতার ভরাট। শক্তিমান কবিদের লেখায় সমৃদ্ধ হলেও বিকাশ সীলের 'নিরস গানের আসর, প্রবন্ধ তথ্যসমৃদ্ধ, পত্রিকার মান বৃদ্ধির সহায়ক। কবিতায় কণ্ঠ তুলেছেন: অরুণ দে, অমিতাভ মিত্র, শ্যামল-বরণ সাহা, জগন্ময় মজুমদার, শুভ্র দেব মজুমদার, পংকজ মণ্ডল, রাজ-কুমার কায়চৌধুরী, অমিত মণ্ডল, গৌতম দাস। অন্য কবিতাগুলি সাধারণ।

সন্ধ্যা: দশমবর্ষ: দ্বিতীয় সংখ্যা: জুন: ৯৫। সম্পাদক: বিজয় চাঁদ ঘোষ, বাদলগড়, মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত। আছে চারটি সাধারণ পর্যায়ের কবিতা, সাঁওতালী গান, রম্যরচনা, বিজয়চাঁদ ঘোষ-এর উপন্যাস 'এই দেহ এই মন' (ধারাবাহিক)। ভ্রমণকাহিনী লিখেছেন: বিনয় মেকে কাস্তীর: অলকরঞ্জন পাল। অনিল দাসের রম্যরচনা: 'আড পাঁচে'র নায়ক হাস্যরসের পোষাক জোগায়। সম্পাদক বিজয়চাঁদ ঘোষের 'মেদিনীপুরে সাক্ষরতার দ্বিতীয় পর্যায়ের মূল্যায়ন' সংক্ষিপ্ত আলোচনা কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ।

সোনালী রোদ: সম্পাদক: প্রবাস মাণিক: বাইশ বর্ষ: জুন, অনুষ্ঠান সংখ্যা: ৯০। নন্দনপুর, হুগলী থেকে প্রকাশিত। মূল্য: পাঁচ টাকা। এই পত্রিকাটি মাসিক। দৃষ্টি আকর্ষক সম্পাদকীয়, লেমেনেশান কভারে মোড়া পত্রিকা, ছাপা ঝকঝকে: পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিয়াত্তর। সংখ্যাটি কুমারেশ ঘোষকে উৎসর্গীত। সোনালী রোদ পুরস্কার ও সংবর্ধনার দীর্ঘ তালিকা ১৯৮৫—৯৪, পুরস্কার প্রাপকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ছবি। রসসাহিত্যিক কুমারেশ ঘোষ-এর ছটি মূল্যবান

অন্তরঙ্গ রসারচনার মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন। ধারাবাহিক উপন্যাসের 'প্রাইভেট টিউটরের' শেষাংশ, শক্তি স্মরণে সুবোধ ঘোষের মূল্যবান কবিতা, এবং 'রাতের চিতা', ছবি, দুটি গল্পসহ চোদ্দটি ভিন্নধর্মের কবিতা। সংস্কৃতি, সংবাদ, গ্রন্থসমালোচনায় ভরপুর। 'রাতের চিতা' (হোসনে আরা বেগম) গল্প বেশ ভালো, গল্পটির একাধিক প্রকাশনার কারণ কি ? 'ছবি' (সনৎ ভট্টাচার্য) গল্পের বিষয়বস্তু পুরানো তবু শেষাংশ হৃদয়গ্রাহী। ভালো কবিতা লিখেছেন : মিতা বসু কর্মকার, সেখ হুরুল হুদা, রাত্রিবসু. মালিনী বসু, অলোকা কাঁড়ার। 'কুড়ি পৃষ্ঠার চিঠি' কবিতার লেখকের নাম সূচীপত্রে নেই, সম্পাদকের সতর্কতা কাম্য।

কাগজে বাঘ : ২, ৩ রোদের ছড়া : ক্রোদের ছড়া এবং দুল্লু রোদের ছড়া। ছড়াকার : সাধন বারিক. আরামবাগ, হুগলী থেকে প্রকাশিত : মূল্য : দুই টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ নেই। ১৬টি ছড়ার দু' একটিতে ছন্দপতন ঘটেছে। ছড়াকার সাধন বারিককে ছড়ার ছন্দ মাত্রা বিষয়ে সজাগ হতে হবে। ছড়ার মধ্যে প্রকৃত ছড়ার ছন্দ প্রকাশ ঘটাতে অক্ষম হলে, ছড়ার সার্থকতা বাধাপ্রাপ্ত হয়। তবে শুধুই ছড়ায় ভরা সংকলন বলে বিশেষ মনোযোগ দাবী করে।

এবং সাহুক : একুশ বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা মে '২৫—সম্পাদক : সূর্য নন্দী। মূল্য : পাঁচ টাকা। প্রতীকী প্রচ্ছদে, ছাপার পরিচ্ছন্ন সংকলনে উনত্রিশটি কবিতা, চারটি ভিন্ন ভাষার কবিতার অনুবাদ, দুটি প্রবন্ধ এবং গল্প সাধারণ সংখ্যাটির প্রকাশ। এই সংখ্যার কবিতার মধ্যে (পরিবর্তনে) মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়. অলোক মহান্তীর (যাত্রী) সুমিতেশ সরকারের (সমীকরণ) বিমলকুমার মাণীর (সময় এনেছে নতুন বার্তা) উত্তরণ ও পরিবর্তনের ইঙ্গিত মেলে। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার 'লোক সাহিত্য, লোক সমাজ', 'নারী নির্যাতন : রবীন্দ্রনাথ ও বিভূতিভূষণ' প্রবন্ধ দুটি পত্রিকার উজ্জ্বল উপহার। 'ব্যবসায়ল্যা ওক্ষেপ ও প্রার্থনার বাতাস' গল্পটি মন ভরাতে পারলো না। ভালো কাগজে—ছাপা পরিচ্ছন্ন।

—শ্যামাপদ প্রামাণিক

উত্তরায়ণ : ১ম সংখ্যা / সম্পাদনা : শ্যামাপদ প্রামাণিক / বেলিয়াঘাটা, নেতাজী ক্লাব, মেদিনীপুর। এই সংখ্যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে

নির্বাচিত একগুচ্ছ কবিতায় প্রয়াত কবির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা প্রকাশিত। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর বেদনাহত ছাপটি সমস্ত কবিতাতেই ব্যক্ত হয়েছে। লক্ষণ কর্মকারের প্রবন্ধে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাব্য জীবনের সামগ্রিক চিত্রের ছায়াপাত ঘটেছে। সংক্ষিপ্ত আলোচনা হলেও তা অনবদ্য।

অন্যান্য কবিতাগুচ্ছের মধ্যে 'সেই মেয়েটি'ও 'অস্তিত্ব' উল্লেখযোগ্য। 'জ্যোৎস্নালোকে বঙ্কিম উপন্যাস' প্রবন্ধটি নতুন ধরণের ভাবনার দৃষ্টান্ত। দিবাকর সী'র 'উড়ান' গল্পটিতে সমাজে নতুন গজিয়ে ওঠা এক শ্রেণী ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর বাস্তব চালচিত্র। প্রথম সংখ্যা হিসেবে পত্রিকাটি লেখায় ও আঙ্গিকে দৃষ্টি কাড়ে।

—দেবাশিস্ চক্রবর্তী

[] গ্রন্থ সমালোচনা []

অবগাহন : সুদর্শন চক্রবর্তী : ভারবহনাদ বুক সিন্ডিকেট, ১০, পি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—৭৩, মূল্য : পনের টাকা।

কবি সুদর্শন চক্রবর্তী, পাঠক সমাজে বিশেষভাবে পরিচিত নন। এই তরুণ কবির কাব্যগ্রন্থ 'অবগাহন'। আটচল্লিশ পৃষ্ঠার দুই মলাটে ছাব্বিশটি কবিতার বেশ কয়েকটি কবিতায় ভাষা প্রয়োগ, ভাব, গতি, লয় পরিশীলিত নয়। তিনটি পর্যায়ে কবিতা আছে : প্রফুল্লকে গোলা চিঠিতে দুয়টি কবিতার মধ্যে : 'আয়না', 'প্রফুল্লকে গোলা চিঠি', 'অং' কবিতা পাঠকদের প্রত্যাশা পূরনে ব্যর্থ, এলোমেলো ছন্দে বড় পীড়াদায়ক। তবু 'স্মৃতি'-র চৌদ্দটি ও দায়বদ্ধ তুমি কিরে প্রসো'র ছয়টি কবিতার মধ্যে 'সৌজন্যমিদ', 'ভাঙাচাঁদ', অনুরোধ', 'তোমাতে তুমি', 'নিরপেক্ষ', 'অবগাহন', 'আসি বসে আছি'র চিত্রকল্প, ভাষা প্রয়োগ আংশিক উত্তম। কবিতার ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে সব ক্ষেত্রে কবি সক্ষম হন নি। আশা করি আরো কবিতা লিখবেন। কাব্য ভাবনায় নিজস্ব নাটকর্ম নির্মাণে সক্ষম হবেন, সচেতন হবেন শব্দ প্রয়োগে। এই কাব্যগ্রন্থের কাগজ ভাল, মোড়ন প্রচ্ছদ, বাঁধাই মজবুত।

—শ্যামাপদ প্রামাণিক

জন্মদাত্রী (ছোট গল্প সংকলন) পুলক রায়

এক অসং সমাজকে তুলীভিগ্রস্ত সমাজের নানা দিক বেশ বিশ্বাসযোগ্য ভাবেই তুলে ধরে রচিত হয়েছে পুলক রায়ের গল্প সংকলন গ্রন্থ 'জন্মদাত্রী'। বইটির প্রথম গল্পের নায়িকা—কমলা-ই মাত্র এই জন্মদাত্রী নয়; সমগ্র সমাজটিকেই যে এই জন্মদাত্রী হিসেবে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা গল্পগুলি পড়লে বেশ বোঝা যায়।

এ কারণেই বলা যায়—গ্রন্থটির নামকরণ বেশ সার্থক। এই সার্থকতা বাড়তি একটা মাত্রা পেয়েছে। এই কারণে যে, প্রথম গল্পটির পরিণতির সঙ্গে শেষ গল্পটির বিপরীত পরিণতি মিলিয়ে পড়লে দেখা যায়—যেন অনন্তের এক নিটোল বৃত্তে প্রত্যাবর্তন হয়ে উপন্যাসোপম সমাপ্তিতে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। গল্পগুলিকে আলাদা মনে হয় না—একটি মালিকার অবিচ্ছেদ্য ফুলের মতো মনে হয়।

জন্মদাত্রীর সঙ্গে অন্যান্যদের সম্পর্ক যেমন জন্মগত আবেগের কারণে আকর্ষণের হয়—তেমনি অনেক অজানার কারণেই হয়ে থাকে বিকর্ষণেরও—এবং তা হয়ে থাকে বিপরীতধর্মী গল্পগুলিতে। এই আকর্ষণ-বিকর্ষণের গল্পগুলি মনোযোগী পাঠকের মনোযোগ দাবি করে।

প্রথম গল্পটি যা-এর কথা বলার মধ্যেই যেন চলে আসে ভাষার ছন্দ। এর শেষের অংশটি তেমন ক্লাসিক মনে হয় নি। দ্বিতীয় গল্পে নায়িকার নারীত্বাভিমানে স্বামী সম্পর্কের সহানুভূতি যে ইঙ্গিতধর্মী সংযোজিত আপন আত্মমানিকর কলুষতার কারণে বিস্বাদ হয়ে গেল, তা বেশ বিশ্বস্ততার সঙ্গেই চিত্রিত। অন্যান্য গল্পগুলি মোটামুটি।

গল্পগুলির কাঠামো ভালো হলেও বাঁধুনি, কিন্তু তত মজবুত নয়। কোনো কোনো গল্পের মূল সুর আর অন্তরঙ্গ গতি তো মাঝে মাঝে বেশ হোঁচট খেয়েছে ভাষার অপ্রয়োজনীয় কারুকার্যের সাবলীল। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় প্রথম গল্পের প্রথমাংশে যেন কিছু অপ্রয়োজনীয় কথা আছে। আর শেষ গল্পটির ভাষা অন্যান্য গল্পে যে ভাষা-গাম্ভীর্য আছে, তার থেকে বিচ্যুত হয়েছে কিছুটা।

প্রচ্ছদটি ভালোই, ছাপাও বেশ ভালো।

—প্রশান্ত সামন্ত

☐ সংস্কৃতি সংবাদ ☐

'উত্তরায়ণ'এর আত্মপ্রকাশ

গত ১৫ই আগস্ট : বেলিয়াঘাটা মেডাঙ্গী ক্লাবের উদ্যোগে প্রথম সাহিত্য পত্রিকা 'উত্তরায়ণে'র আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটল। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রান্তের নবীন-প্রবীন লেখক, শিক্ষাবিদ্, সাংবাদিক ও সম্পাদকগণের উপস্থিতিতে এক প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রথমেই মাইতির উদ্বোধনী সঙ্গীতে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মুরারীমোহন মণ্ডল, প্রধান অতিথি সাংবাদিক অশোক চট্টোপাধ্যায়, বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে বিশিষ্ট ছোট গল্পকার তারাপদ দাস এবং বিশিষ্ট গল্পকার—দিবাকর সী। স্বাগত ভাষণ দেন ক্লাবের পক্ষে শিবরাম মণ্ডল। অনুষ্ঠানে 'উত্তরায়ণ' সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেন—বিশেষ অতিথি সাংবাদিক অশোক চট্টোপাধ্যায়। আলোচনা সভায় ঘাটাল মহকুমার সাহিত্য আন্দোলন-এর গতি-প্রকৃতি প্রসঙ্গে আলোচিত হয় কবি দিবাকর সী তাঁর মনোজ্ঞ আলোচনায় মহকুমার সাহিত্য আন্দোলনের বিভিন্ন দিকের উল্লেখ করেন। 'উত্তরায়ণ' সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্যে মহকুমার সাহিত্য আন্দোলনকে গতিশীল করার জন্য সম্মিলিত প্রয়াসের উপর গুরুত্ব দেন। উক্ত অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠে অংশ নেন উল্লেখযোগ্য কবি গল্পকার তারাপদ দাস, দিবাকর সী, অরুণেশ চট্টোপাধ্যায়, সুপর্ণা নন্দীগ্রামী, শ্যামাপদ প্রামাণিক প্রমুখ সভাপতি মুরারীমোহন মণ্ডল ও বিশেষ অতিথিগণ 'উত্তরায়ণে'র দীর্ঘায়ু কামনা করে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন 'উত্তরায়ণ' সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক : শ্যামাপদ প্রামাণিক।

'সৃজন' পত্রিকার সম্পাদক পুরস্কৃত

গত ১৯শে আগস্ট : আরামবাগের রামমোহন হলে কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ্গণের উপস্থিতিতে মাসিক পত্রিকা 'সোনালী রোদে'র সাহিত্য পাঠের অনুষ্ঠানে 'সৃজন' পত্রিকার সম্পাদক [illegible] কর্মকার 'সোনালী রোদ' পুরস্কারে সম্মানিত হলেন। পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের সভাপতি, আরামবাগের মহকুমা শাসক সুবক্তা, কবি নিখিলেন্দু হাজরা। এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'সৃজন' পত্রিকার সম্পাদক লক্ষ্মণ কর্মকার বিশেষ অতিথি, গঙ্গাধর সাহেব ও মহম্মদ গোলাম।

অনুষ্ঠান প্রারম্ভে 'সোনালী রোদ' পত্রিকার সম্পাদক প্রশান্ত মালিক অনুষ্ঠানের প্রাসঙ্গিকতা আলোচনায় পত্র-পত্রিকার প্রকাশ প্রকাশনা নানা সমস্যার উপর আলোকপাত করেন। প্রধান অতিথি 'সৃজন' পত্রিকার সম্পাদক লক্ষ্মণ কর্মকার তাঁর ভাষণে সাহিত্যিকদের সাধারণ মানুষের কথা তুলে ধরতে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন—নিখিলেন্দু হাজরা, অমুজ বসু, কবি জিয়াদ আলি সাম্প্রতিক সাহিত্যের উপর আলোচনা করেন।

কবি শ্যামাপদ প্রামাণিক গৌতম চট্টোপাধ্যায়, সুদর্শন চক্রবর্তী, লক্ষ্মণ কর্মকার নিখিলেন্দু হাজরা, জিয়াদ আলি, রামমোহন সামন্ত, হোসনে-আরা-বেগম, নলিনী বেরা, সাধন বারিক, সুদীপ ঘোষ, সন্তু সরকার, দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়, সুশান্ত চক্রবর্তী, প্রশান্ত প্রামাণিক, রবীন আচক, আলোক চন্দ্র প্রমুখ সাহিত্য পাঠ করেন। কবিতা, ছড়া, গল্প আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে পরিবেশিত হয় আমন্ত্রিত শিল্পীর গান।

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ঃ স্রষ্টা ঃ স্মরণ

গত ২৩শে এপ্রিল বাটানগর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ে এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে মহকুমার প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে প্রবীণ কবি ব্রজেন দে'র সভাপতিত্বে কবি 'শক্তি চট্টোপাধ্যায় স্রষ্টা : স্মরণ' অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিল 'সৃজন' ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা। সৃজন পত্রিকার সম্পাদক লক্ষ্মণ কর্মকার কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের কবি এবং সৃষ্টি কর্মের নানা ঘটনা স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেন। অনুত্তম বিশ্বাসের কণ্ঠে 'কোথাও মৃত্যু.....' গানটি অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য মাত্রা যোগ করে। স্বরচিত কবিতার মাধ্যমে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানান—বিবেকানন্দ দাস, শ্যামাপদ প্রামাণিক, বিজয়চাঁদ ঘোষ, স্বপনকুমার মাজী, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন দে প্রমুখ। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা পাঠ করেন—শুভাশিষ রায়, দেবাশিস ভট্টাচার্য, ত্রিদিব বেরা, দিবাকর দে প্রমুখ। অনুষ্ঠান উপলক্ষে 'সৃজন' পত্রিকার উদ্যোগে শক্তির প্রসঙ্গে সুন্দর ফোল্ডার প্রকাশিত হয়।

আশাপূর্ণা দেবী ঃ

গত ১৩ই জুলাই ১৯৯৫ ভোর পাঁচটায় বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবী চলে গেলেন। যদিও তাঁর নাম আশাপূর্ণা গুপ্ত, তবুও আশাপূর্ণা দেবী নামেই তিনি সমধিক পরিচিতা ছিলেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৯০৯ এ। ১৩ বছর বয়সে 'শিশুসাথী' পত্রিকায় 'বাহিরের ডাক' নামে একটি গল্প প্রকাশের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব ঘটে। তারপর থেকে তাঁর কলম আর থেমে থাকে নি। ঘরের কাজের সঙ্গে মিলমিশ সাহিত্যচর্চা করেছেন এবং সাহিত্য চর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ অজস্র পুরস্কারে ভূষিতা হয়েছেন আশাপূর্ণা দেবী। জ্ঞানপীঠ, রবীন্দ্র পুরস্কার, সেন্ট্রাল একাডেমী, পদ্মশ্রী পুরস্কার ছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট উপাধিতেও ভূষিতা হয়েছেন। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা ১৭টি, ছোট গল্প সংকলন ৩০টি এবং ছোটদের জন্য বইয়ের সংখ্যা ৪০টি। বিভিন্ন ভাষায় ৮০টি গল্প এবং ১৫টি উপন্যাস অনুদিত হয়েছে। তাঁর লেখাকে কেন্দ্র করে পূর্ণাঙ্গ ছবি হয়েছে ৭টি। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা' এবং 'বকুলকথা' তাঁর বিখ্যাত ত্রিলজী উপন্যাস।

আশাপূর্ণা দেবীর স্মরণসভা ও সাহিত্যবাসর ঃ

গত ইং ১৯-৮-৯৫ শনিবার বিকাল ৩টায় কলোড়া রবীন্দ্র মিত্রালী সংঘ পাঠাগারে অর্ঘ্য (ত্রৈমাসিক সাহিত্য বিষয়ক) পত্রিকার উদ্যোগে প্রয়াতা লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর স্মরণসভা ও একটি মনোজ্ঞ সাহিত্যবাসর অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বেলা ২টায় বিকেলের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন পত্রিকা সম্পাদক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মাজী মহাশয়। এই অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করেন কলোড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মাননীয় শ্রীশ্যামসুন্দর মণ্ডল মহাশয়। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে মাননীয় শ্রীঅজয় সেনগুপ্ত (শিক্ষক, সোনাপালি উচ্চ বিদ্যালয়) ও শ্রীমাধবচন্দ্র বারিক (শিক্ষক, পাঁশা ভারতবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়)। সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ছাড়াও প্রয়াতা আশাপূর্ণা দেবীর উপর মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন, অভিজিৎ চক্রবর্তী, ভবানীশঙ্কর চক্রবর্তী, শিক্ষক ভগবান্দ ভানা প্রমুখ। অনুষ্ঠানের ২য় পর্যায়ে ত্রিলজন কবির সাহিত্যবাসর এবং সবশেষে সভাপতির মূল্যায়ন সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে ভিন্ন মর্যাদা দিয়েছিল।

সলিল চৌধুরী ঃ

গত ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ বিশিষ্ট সুরকার সঙ্গীত শিল্পী সলিল চৌধুরী মঙ্গলবার রাত ১১টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯। 'হেই রোকো, পৃথিবীর গাড়িটা থামাও, আমি নেমে যাবার মত লাইন বেরিয়েছিল যাঁর কলম থেকে তিনি দুঃস্বপ্নেও ভাবেন নি 'সেরিব্রাল হেমারেজ' এভাবে হঠাৎই থামিয়ে দেবে তাঁর সুরের গাড়ি।

সুরের সাধনা আর মানুষের সংগ্রামকে যিনি মিলিয়ে-মিশিয়ে একাকার করতে চেয়েছিলেন একই জিনুতে, সেই সলিল চৌধুরীর জন্ম অসমের চা বাগান ঘেরা শান্ত পটভূমিতে। পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে চলে সঙ্গীত চর্চা। গান, তবলা, এস্রাজ, বাঁশি, বেহালা সমস্ত রকম যন্ত্রসঙ্গীতেই ছিল তাঁর সহজাত দক্ষতা। সুরের মায়া সৃষ্টি করার অপূর্ব ক্ষমতা তো ছিলই। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পা রাখার পর তাঁর সাঙ্গীতিক চেতনার সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনাও পুষ্ট হতে শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশঃ শিল্পীর সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে ভাবতে শিখিয়েছিল তাঁকে। এই ভাবনা থেকেই চারের দশকের মাঝামাঝি যোগ দিয়েছেন ইন্ডিয়ান পিপলস্ থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশনে। অংশ নিয়েছেন গণসঙ্গীত আন্দোলনে। শরিক হয়েছেন কৃষকদের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে। সদস্য হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের। এবং এই দায়বদ্ধতাই জন্ম দিয়েছে আধুনিক বাংলা গানের ইতিহাসে স্থায়ী স্থান পেয়ে যাওয়া অসংখ্য গণসঙ্গীতের। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই উঠে এসেছে 'কোন এক গাঁয়ের বধূ', নৌ বিদ্রোহের পটভূমিতে জন্ম নিয়েছে 'ঢেউ উঠছে কারা টুটছে', দিন আনা দিন খাওয়া মানুষদের জন্য লিখেছেন 'হেই সামালো ধান'-এর মত রক্তে দোলা দেওয়া গান। 'রাণার' এবং 'পাখী চলে' কবিতার অপূর্ব সুর সৃষ্টি তাঁকে অমর করে রেখেছে। হিন্দী গানের জগতেও তাঁর অবদান কম নয়। শেষ পর্যন্ত ঝড়ের কাছে ঠিকানা রেখে দিয়ে তিনি চিরদিনের মত অন্য জগতে চলে গেলেন, যে জগতের ঠিকানা আমাদের জানা নেই।

আপনার জরুরী প্রয়োজনের ওষুধটি খুঁজছেন ?
নিশ্চিত বিশ্বাসে চলে আসুন—

ডলফিন মেডিকেল স্টোর্স

(খড়ার স্টপার মার্কেটের নিকট)

প্রোঃ—ডাঃ অচ্যুতকুমার মণ্ডল

কলকাতার দামে সুলভে এ্যালোপ্যাথি ঔষধ
পাওয়ার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

◎ কুকুরে কামড়ানো ভ্যাকসিন সব সময় পাওয়া যায়।

খড়ার ঃ মেদিনীপুর

দাসপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতি

দাসপুর ঃ মেদিনীপুর

দাসপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতি নিম্নলিখিত কর্মসূচীগুলি রূপায়ণের জন্য গুরুত্ব আরোপ করেছে।

১। সমাজে অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ান।

২। জনশিক্ষার প্রসার ও সাক্ষরতা-উত্তর কর্মসূচী গ্রহণ।

৩। জনগণের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা।

৪। শিক্ষা সংস্কৃতি ও ক্রীড়া-প্রসারে উদ্যোগ গ্রহণ।

৫। ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মধ্যে সরকারী খাস জমি বিলি-বন্টন।

৬। গ্রামীণ রাস্তা, কালভার্ট, ফুট-ব্রীজ নির্মাণ ও মেরামত।

৭। বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ, মেরামত ও খেলার মাঠ তৈরী।

৮। জেলা গ্রামীণ বিকাশ সংস্থার মাধ্যমে (DRDA) গ্রামীণ গরীব জনগণের আর্থিক উন্নতি সাধন।

৯। পানীয় জলের ব্যবস্থা।

১০। মৎস্য চাষ ও পশুপালন।

১১। গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ।

১২। ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের প্রসার।

১৩। গৃহহীনদের জন্য ইন্দিরা আবাস যোজনার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ।

১৪। স্বল্প আয়ের পরিবারের জন্য ভর্তুকিতে শৌচাগার নির্মাণ।

১৫। জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্ব আরোপ।

১৬। কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি সেচ ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ।

শ্রীদেবল বন্দ্যোপাধ্যায়
নির্বাহী আধিকারিক

শ্রীরামেশ্বর দোলই
সভাপতি

শারদ উৎসবে
সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই ঃ

হোমিও কিওর

[ঘাটাল পোষ্ট অফিসের সামনে]

এখানে 'মহেশ ভট্টাচার্য', 'শেঠ কে' 'কিং কোং'
এবং বিভিন্ন কোম্পানীর হোমিওপ্যাথিক
ঔষধ পাওয়া যায়।

★ এখানে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ নিয়মিত রোগী দেখছেন—

ডাঃ শিবনাথ মোদক

ডাঃ নির্মলচন্দ্র সুকুল

সময় ঃ প্রতিদিন সকাল ৯—১১টা
বিকেল ৫·৩০ — ৬·৩০ পর্যন্ত

পোষ্টঅফিসচক ★ ঘাটাল ★ মেদিনীপুর

নিবিড় স্বাস্থ্যবিধান প্রকল্প—মেদিনীপুর

মাত্র ৩১৫ টাকায় একটি শৌচাগার নির্মাণ করিয়া
আপনার মা-বোনের সম্ভ্রম রক্ষা করুন।

[] সহযোগিতায় []

★ কেন্দ্র, রাজ্য সরকার ও ইউনিসেফ ★

[] পরিচালনায় []

রামকৃষ্ণ মিশন নরেন্দ্রপুর লোকশিক্ষা পরিষদ

[] ঘাটাল মহকুমা রূপায়ণে []

সার্বিক গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র, দাসপুর

এলাকায় শৌচাগার, ধূমহীন চুল্লী, শোষকগর্ত, স্নানের চাতাল
নির্মাণ করিয়া পরিবেশ দূষণ মুক্ত করুন ও পরিবারের
সদস্যদের রোগের হাত হইতে রক্ষা করুন।

যোগাযোগ করুন

স্থানীয় পঞ্চায়েত ও ক্লাবগুলিতে

With Best Compliments of :

Phone DSP-202

M/s Popular Enterprise

(General Hardware & Order Supplier)

Daspur Midnapur

Pin—721211

All kinds of Hardware, Sanitary goods, Apparatus (Silver & Machine) and G. I , P. V. C. Pipes, Filter, Hand pumps, Pipe of Mini deep-Shallow & Tube-well Accessaries are available here.

CONTRCT FOR Submersible Pump Set, Electric Motor, Disel Engine, Water Tank, Jet & Tulu Pump.

উৎসবে ও আনন্দমুখর অনুষ্ঠানের জন্য

নিশ্চিন্তে করে—

বেরা মাইক সার্ভিস

প্রোঃ—সুজিত কুমার বেরা

জিয়াখালি [যশোড়া মাঠ] মেদিনীপুর

[] স্থানীয় যোগাযোগ []

দাসপুর কৃষ্টি সংসদ

(দাসপুর)

শিব দুর্গা পেন ফ্যাক্টরী

প্রোঃ [] মদনমোহন পাত্র

আধুনিক মডেলের যাবতীয় পেন তৈরী হয় এবং পাইকারী বিক্রয় হয়।

গ্রাম+পোঃ—বালক রাউৎ ঃ মেদিনীপুর

পৃষ্ঠা ভালভাবে গ্রহণ করান

মোদী ফিল্টার
এবং
মোদী পি ভি সি পাইপ

দীর্ঘস্থায়ী ❊ মজবুত ❊ কম দাম
৫০ বছরের গ্যারান্টি।

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

মেসার্স—পপুলার এণ্টারপ্রাইজ

দাসপুর [] মেদিনীপুর

ফোন ৫৭-১০১

'সৃজন'কে
শারদীয় অভিনন্দন জানাই ঃ

কিশোরী মোহন পাত্র

গ্রাম ।-পোঃ—বালকরাউৎ [] মেদিনীপুর

আপনার প্রিয় গৃহকোণ মনোরম
সৌন্দর্যে, আধুনিক রুচির আসবাবে
সাজাতে আজই আসুন—

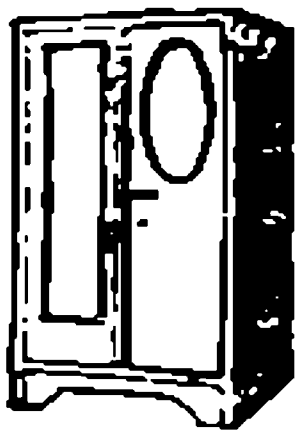

অপর্ণা ষ্টীল এ্যাণ্ড এণ্টারপ্রাইজ

[ষ্টীল আসবাবপত্রের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

প্রোঃ—মদনচন্দ্র হাঁড়া

আড়গোড়া [কাঠগোলার পাশে]
ঘাটাল ঃ মেদিনীপুর

'সৃজন' এর প্রতি

আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই :

প্রীতিশংকর চৌধুরী

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়

ঘাটাল [] মেদিনীপুর

Best Wishes to 'Sreejan'

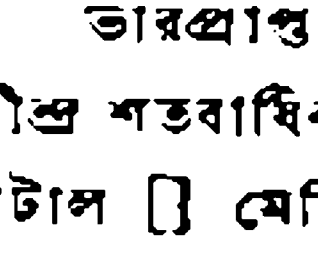

A WELL WISHER

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন ঃ

সুবোধ ফার্মেসী

(ড্রাগিষ্ট এ্যাণ্ড কেমিষ্ট)

ডাঃ মোহিনীমোহন শাসমল

শিশুরোগ ও চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ

কুশপাতা ☐ ঘাটাল ☐ মেদিনীপুর

ডুপন্ন ঃ ডুপন্ন ঃ ডুপন্ন ঃ ডুপন্ন

রিজিড পি. ভি. সি. পাইপ

নির্মাতা—দুর্গাপুর পরিমার্জস প্রাঃ লিঃ, দুর্গাপুর

আই এস সমতুল্য কারণ প্রতিটি কিউবিক সেন্টিমিটার সর্বাক্ষেত্রেই আশ্বাস দেয়।

কমপক্ষে ৫০ বছর আয়ু
ঢালাই পাইপের তুলনায় দাম কম
স্বাস্থ্যকর (W.H.O. দ্বারা স্বীকৃত)
পাইপের ভেতরের গায়ে ময়লা জমে না
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন খরচ লাগে না
সহজ পাঁচ যুক্ত

শ্যালো • ডিপটিউবওয়েল • বাড়ীর জলের পাইপ-লাইন প্রভৃতির ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য ও গ্যারেন্টিযুক্ত।

ডিলার ঃ

মেসার্স—পপুলার এণ্টারপ্রাইজ

দাসপুর ঃ মেদিনীপুর

ফোন দাসপুর-54-202

Palco Hardware

Starand Road
Calcutta-1

Alaways Use Palco Brand

Palco Hand Pump

Palco Brass Cylinder

Palco Brass Filter.

ক্ষীরপাই পৌরসভা

নব সাক্ষরদের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে জেলা ভিত্তিক ৪টি পুরস্কার অর্জনের অনন্য গৌরবের অধিকারী এই পৌরসভা সার্বিক সচেতনতা ও সক্ষমতার লক্ষ্যে নিরলস লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

পৌরসভার সার্বিক উন্নয়নে আপনার অকুণ্ঠ সহযোগিতা আমাদের পাথেয়।

ধনঞ্জয় পান
ভাইস্-চেয়ারম্যান
ক্ষীরপাই পৌরসভা

দুর্গাশংকর পান
চেয়ারম্যান
ক্ষীরপাই পৌরসভা

নিত্য নতুন আভরণ
অঙ্গে অঙ্গে শোভা
'দাস জুয়েলারী'র গহনা
হবেই মনোলোভা।

দাস জুয়েলারী

[ঘাটাল-মেদিনীপুর বাসস্ট্যাণ্ডের পশ্চিমে]

প্রোঃ { বাসুদেব দাস
প্রদীপ দাস

আড়গোড়া, ঘাটাল, মেদিনীপুর

শারদ উৎসবের মুহূর্তে
আমাদের প্রীতি ও মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় হোক ঃ

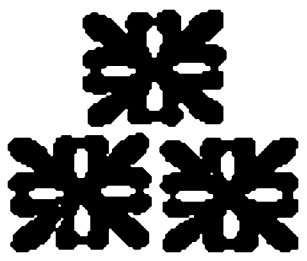

সামন্ত সাপ্লায়ার্স

[স্থান ঃ হাসপাতাল ২নং গেটের সামনে]

পাকা বাড়ী তৈরীর জন্য
সেন্টারিং এর তক্তা, মিকশ্চার মেশিন, ভাইব্রেটর
মেশিন, কোদাল-কড়াই ইত্যাদি নানাপ্রকার
সরঞ্জাম সুলভ ভাড়াতে পাওয়া যায়।

কৃষ্ণপাতা ❋ ঘাটাল ❋ মেদিনীপুর

[ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালের ২নং গেটের সামনে]

আপনি কি সঞ্চয়ে আগ্রহী ?
অথচ অর্থের পরিমাণ সামান্য বলে সংকোচবোধ করছেন ?
চিন্তা নেই। যোগাযোগ করুন—

উৎপল পাখিরা

[টিনি সেভিংস এজেন্ট]

ঘাটাল থানা কো-অপারেটিভ এগ্রি মার্কেটি সোসাইটি লিমিটেড

আপনার প্রতিদিনের সঞ্চয় বাড়ি থেকে সংগ্রহ করা হবে।
এই ব্যাঙ্কে অন্যান্য আমানতেও টাকা সঞ্চয় করতে পারেন।
• ঘাটাল থানা কো-অপারেটিভ এগ্রি মার্কেটিং-এর পাশেই বাড়ি।

ঘাটাল ঃ হাসপাতালচক ঃ মেদিনীপুর

আপনার প্রতিদিনের সংবাদপত্রের জন্য যোগাযোগ করুন

স্বপনকুমার ঘোষ

'আনন্দবাজার', 'আজকাল', 'বর্তমান', 'টেলিগ্রাম', 'দেশ'
'সানন্দা' ইত্যাদি সংবাদপত্র এবং
সাপ্তাহিক পত্রিকার এজেন্ট।

ঘাটাল ▲ মেদিনীপুর

শারদীয়ার পুণ্য লগ্নে সকলের সুস্বাস্থ্য ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি—

নিউ মহামায়া ফার্মেসী

সকল প্রকার এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ পাইবার
নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

হাসপাতালরোড ✪ ঘাটাল ✪ মেদিনীপুর

ঘাটাল মহকুমার সুস্থ সাহিত্য চর্চায়
প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠুক 'সৃজন'

বিদ্যাসাগর পুস্তকালয়

স্কুল-কলেজের বই, খাতা, লেখন সামগ্রী এবং
খেলাধুলার সাজ-সরঞ্জাম বিক্রেতা।

খুকুড়দহ ✪ মেদিনীপুর

'হঞ্জন'-এর শারদীয় আত্মপ্রকাশে
আন্তরিক অভিনন্দন জানাই—

বাড়ির সুরক্ষা ও সৌন্দর্যের প্রতীক—

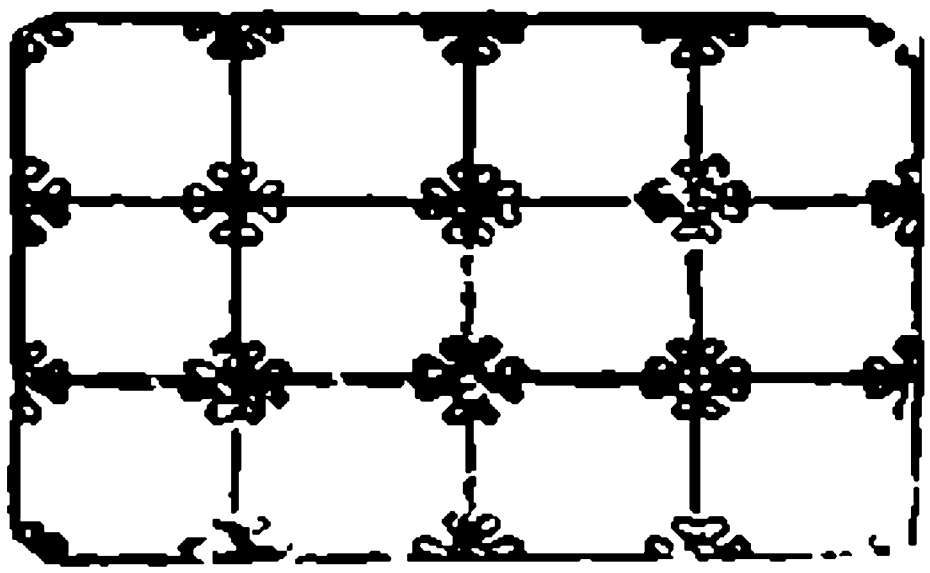

মাইতি ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস

[রেজিস্টার্ড নং—২১।১২।০৩১৪০]

এখানে লোহার গ্রীল, গেট, স্টীলউইণ্ডো, রোলিং সাটার, ধান ঝাড়াই মেশিন, স্টীল আলমারি, চেয়ার, ফোল্ডিং টেবিল এবং লোহার বিভিন্ন জিনিস তৈরী ও মেরামত করা হয়।

দাসপুর বকুলতলা (মামুদপুর)
দাসপুর ঃ মেদিনীপুর

ঘর সাজাবার উপকরণ সুন্দর রুচিসম্মত
আসবাবপত্র। অবশ্যই ছিমছাম ফার্নিচার।
সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়ে সাদর আমন্ত্রণ
জানাচ্ছে—

মহাকালী ফার্নিচার

প্রোঃ—কার্ত্তিকচন্দ্র মহীশ

নামী দামী সাইজ কাঠ এবং মনের মত
আসবাবপত্র তৈরীর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

আড়গোড়া (কাঠগোলা) ঘাটাল
মেদিনীপুর

শারদ উৎসবে আমাদের মৈত্রী অক্ষুণ্ণ থাকুক :

মহাপাত্রে এণ্টারপ্রাইজ

[অর্ডার সাপ্লায়ার্স]

ইট, বালি, সিমেণ্ট, স্টোনচীক্স, বোল্ডার ইত্যাদি
গৃহ নির্মাণের বিবিধ উপকরণ উচিত মূল্যে
পাওয়ার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

প্রোঃ—শ্রীবংশীবদন মহাপাত্র

সিংহডাঙ্গা ❁ রাধানগর ❁ মেদিনীপুর

আপনার স্বপ্নের গৃহটির সুন্দর প্ল্যান হাতে পেয়ে গেলেন—
ব্যাঙ্ক বা এল-আই-সি থেকে প্রয়োজনমত ঋণও পেয়ে গেলেন—
তারপর ? একজন অভিজ্ঞ, নির্ভরযোগ্য নির্মাণশিল্পী তো চাই—
চিন্তা নেই। আপনার কাছাকাছি আছেন—

দিলীপ কুমার বাগ

আপনার স্বপ্নের বাড়িটির রূপকার

❋ কনট্র্যাক্ট অথবা ডেলী মজুরীর ভিত্তিতে
দায়িত্ব নিয়ে নতুন বাড়ি তৈরী করি।

যোগাযোগ ঃ বন্যাকা টেন্টার্স

ঘাটাল ঃ পানবাজার

বাড়ির ঠিকানা—গড়প্রতাপনগর, ঘাটাল, মেদিনীপুর

L.I.C.-র পলিসি করার জন্যও যোগাযোগ করুন।
পাবেন উন্নত, নির্ভরযোগ্য পরিষেবা।

'সৃজন' পত্রিকার অগ্রগতি কামনা করি ঃ

পঞ্চানন ফিস কমিশন এজেণ্ট

[মাছের আড়ৎ]

বিবাহ, অন্নপ্রাশন, যে কোন অনুষ্ঠানে প্রয়োজন
মতো মাছের অর্ডার নেওয়া হয় এবং
যত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয়।

প্রোঃ—বিশ্বনাথ বাগ

রাধানগর ঃ মেদিনীপুর